মস্কোতে

কয়েক দিন

মস্কোতে
কয়েক দিন

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

অভিজিৎ প্রকাশনী
৭২-১, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

প্রথম প্রকাশ :
আশ্বিন—১৩৬৫

প্রকাশক
অমরেন্দ্র দত্ত
অভিজিৎ প্রকাশনী
৭২-১, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

ব্লক ও মুদ্রণ
অজিতমোহন গুপ্ত
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও
৭২-১, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

বেঁধেছেন
শ্রীকৃষ্ণ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
কলিকাতা—৯

প্রচ্ছদ-শিল্পী
বিভূতি সেনগুপ্ত

মূল্য—তিন টাকা

শ্রীযুক্ত মুল্‌ক্‌রাজ আনন্দ

প্রিয়বরেষু

টালা পার্ক, কলিকাতা-২

১লা আশ্বিন, ১৩৬৫



তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

[মস্কোতে গৃহীত ফোটো হইতে]

উপবিষ্ট ঃ—(বাঁদিক থেকে) ১। মিঃ আলেক্সি সুরকভ ২। মিঃ ইউসুফ এল-শিবাই ৩। মিঃ শারাফ রসিদভ ৪। লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ৫। মিঃ যোশি হোত্তা

দণ্ডায়মান ঃ—(বাঁদিক থেকে) ১। মিঃ মুসি সাদ এল-দিন ২। মিঃ গে বাও সুয়ান ৩। মিঃ আলেকজান্দার চেকোভ্‌স্কি ৪। শ্রীমুল্‌ক্‌রাজ আনন্দ ৫। মিঃ ইয়ান সুই পো।

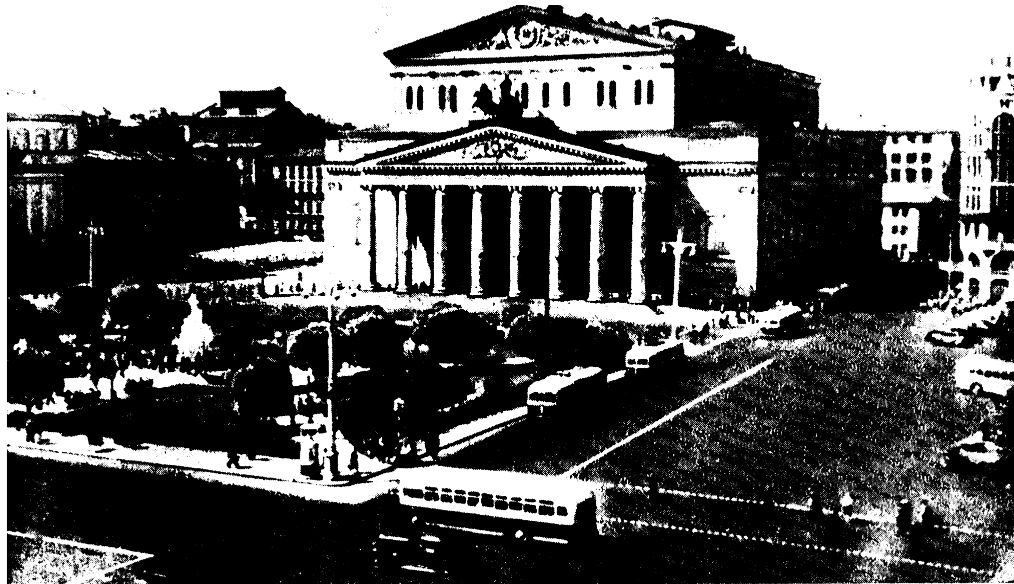
বাঁদিক থেকে ঃ— ১। মিঃ ইউসুফ এল-সিবাই ২। মিঃ শারাফ রসিদভ ৩। শ্রীমুল্‌ক্‌রাজ আনন্দ ৪। মিঃ আলেকজান্দার চেকোভ্‌স্কি ৫। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ৬। মিঃ যোশি হোত্তা



স্পাসকি টাওয়ার, ক্রেমলিন, মস্কো

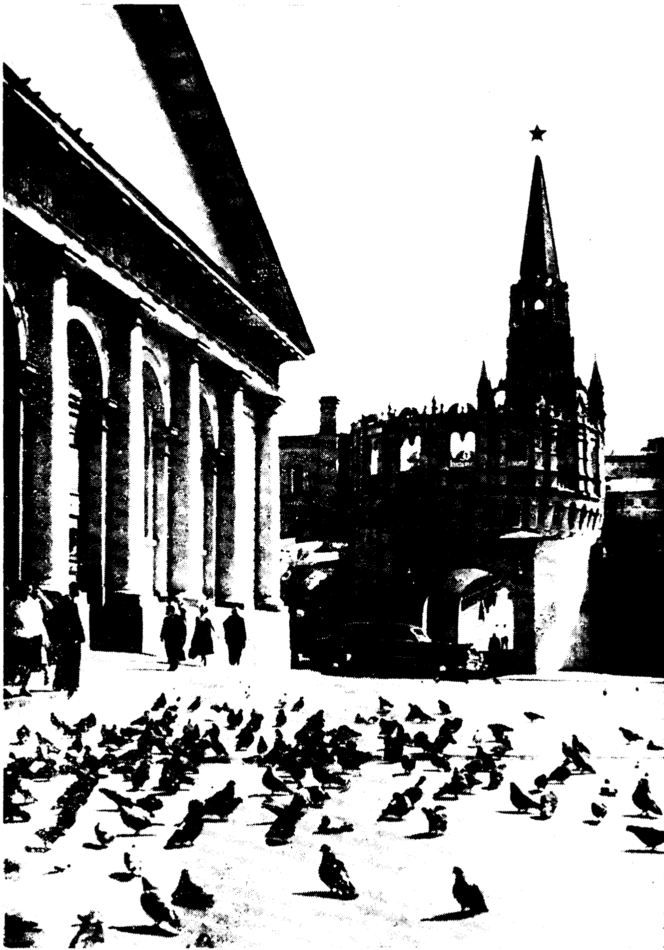


লেনিনগ্রাড্ হোটেল, মস্কো

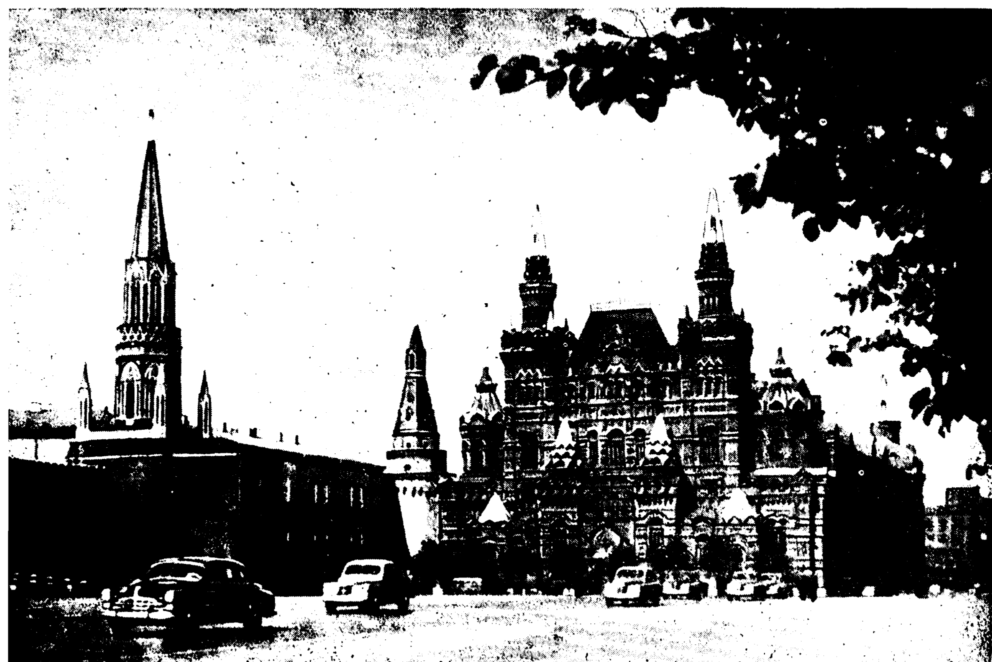


বল্‌শয়্ থিয়েটার, মস্কো

লেনিন লাইব্রেরী, মস্কো



মানিয়েজ্‌নয়্‌ স্কোয়ার, মস্কো



রেড স্কোয়ার, মস্কো

ন দিনের জন্য মস্কো গিয়েছিলাম। বলতে পারতাম মস্কো দেখে এলাম, কিন্তু তা বলা চলে না, মস্কোর অনেক দ্রষ্টব্য স্থান দেখার সময় হয় নি। বলতে পারি, ন দিন মস্কোয় থেকে এলাম। ন দিনের মধ্যে চার দিন এশিয়ান এবং আফ্রিকান লেখক-সম্মেলনের উদ্যোগসমিতির বৈঠক চলেছে দু বেলা। বাকী পাঁচ দিনের দশ বেলার মধ্যে কয়েক বেলা বিভিন্ন সাহিত্যিক সংস্থা ও সংবাদ-পত্রের আপিসে আলাপ-পরিচয়ে আলোচনায় কেটেছে। কাজেই চলাফেরার পথে যেটুকু চোখে পড়েছে, ততটুকু দেখেছি। সুতরাং এই ন দিনের মস্কো দেখা বা রাশিয়াকে চেনা একান্তভাবে কয়েক নজর উঁকি মেরে দেখার সামিল।

১৯৫৬ সনে দিল্লিতে এশিয়ান লেখক-সম্মেলন হয়েছিল। সেই সম্মেলনে সোভিয়েট রাশিয়ার এশীয় দেশগুলির প্রতিনিধিরা তাসকেন্দে দ্বিতীয় সম্মেলন আহ্বান করে গিয়েছিলেন। সেই সম্মেলন হবে এবার অক্টোবর মাসে। এবার শুধু সারা এশিয়া নয়, সারা এশিয়া এবং আফ্রিকা—এই দুই মহাদেশের প্রতিনিধি-স্থানীয় লেখকবৃন্দ তাসকেন্দে সমবেত হবেন। এই সমবেত হবার আকুতি, পরস্পরের সঙ্গে পরিচয়, ভাব-বিনিময়, বস্তু-বিনিময়ের ইতিহাস সুপ্রাচীন, এবং মানবজীবনের অন্তরতম উৎসস্থল থেকে স্বতোৎসারিত। সমুদ্রে পাল-সম্বল জাহাজে চড়ে মানুষ প্রায় অকূলে ভেসেছে, কত জাহাজ ডুবেছে, দিক হারিয়েছে, কত জাহাজ সপ্তসমুদ্রে তার যাতায়াতের পথের ইশারা তাদের কাহিনীর মধ্যে রেখে গিয়েছে। দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল, মরুকান্তারে

কত পথিকবাহিনী প্রাণ হারিয়েছে, কত পথিকবাহিনী বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে পথরেখার চিহ্ন রেখে গিয়েছে। মানুষে মানুষে দেওয়া-নেওয়া হয়েছে। বস্তুপুঞ্জের বিনিময় ব্যবসা-বাণিজ্য এক দেশকে অপর দেশের প্রতি লুব্ধ করে তুলেছে। ফলে এসেছে লুণ্ঠনকারীর রক্তাক্ত অভিযান, রাজ্যলোভী সাম্রাজ্যবাদীর সেনাবাহিনী। কিন্তু অন্য দিকে এসেছেন কত মর্মসন্ধানী, ভাব-সন্ধানী; এক দেশের মর্মস্বাদ, তার ভাববাদ বহন করে নিয়ে গিয়েছেন তাঁদের দেশে; আবার নিজের দেশের মর্মস্বাদ এবং কল্যাণজনক ভাববাদকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দেশদেশান্তরে বহন করে নিয়ে গিয়ে বলেছেন, এই অমৃত আমরা পেয়ে ধন্য হয়েছি, তাই তোমাদের জন্য বহন করে এনেছি, তোমরা গ্রহণ কর। আবার এক দেশের সূক্ষ্ম শিল্পকর্মের নমুনা অন্য দেশের শিল্পকে সমৃদ্ধ করেছে। রাশি-রাশি পুঁথি গিয়েছে, পুঁথির পাটার চিত্রনমুনা গিয়েছে, ভাস্কর্য-স্থাপত্য-চিত্রশিল্প এক দেশ থেকে অন্য দেশে গিয়ে সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধতর নূতনের সৃষ্টি করেছে। হাজার-হাজার বৎসরের এই আলো এবং কালোয় বিচিত্র ইতিহাসের মধ্যে এইটুকুই স্বর্ণসেতুর মত অক্ষয় গুণে অমৃতময় স্বাদে মধুময় হয়ে রয়েছে। এইখানেই মানুষের আশাভরসা নিহিত। না-হলে প্রচণ্ডতম অস্ত্রবুদ্ধির অধিকারী মানুষ যেখানে লোভ, হিংসা ও অবিশ্বাসের তাড়নায় একে অন্যকে ধ্বংস করবার জন্যই কৃতসঙ্কল্প, সেখানে ত সম্মুখে মৃত্যু ছাড়া কিছু নেই!

মস্কো থেকে ফেরবার সময় জেট প্লেনে সূর্যাস্তের ঘণ্টা দেড়েক পরই ছত্রিশ হাজার ফুট উপরে উঠে এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখেছিলাম। দেখেছিলাম, সারা আকাশ নিকষ কালো, কিন্তু পূর্ব দিগন্তে উদয় মুহূর্তে স্বর্ণচ্ছটার আভাসের সঙ্গেই তুলনীয়। এশিয়া লেখক-সম্মেলনে সত্যই এর আভাস পেয়েছিলাম। অনেক অবিশ্বাস, অনেক রাজনৈতিক সন্দেহ প্রথমটায় বিভ্রান্ত করেছিল, কিন্তু পরিশেষে

এসব উত্তীর্ণ হয়ে ওই আভাস আমি প্রত্যক্ষ করেছি। তাই গত ২১শে মে হঠাৎ যখন মস্কোর সোভিয়েট লেখকসংঘ থেকে এশিয়া ও আফ্রিকা লেখক-সম্মেলনের উদ্যোগসমিতির নিমন্ত্রণ পেলাম, তখন তাকে উপেক্ষা করতে পারলাম না। সময় অল্প; ১লা জুনের পূর্বেই মস্কোয় উপস্থিত হতে হবে। আমার হাতে কাজ অনেক; সেখানে বেশী দিন থাকতে হলে সে-সব কাজ নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করতে পারব না; আমার কনিষ্ঠা কন্যার উপর অস্ত্রোপচার হবে মাসখানেকের মধ্যে বা মাসখানেক পরে; এসব বিবেচনা করে এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম এই সর্তে যে আমি উদ্যোগসমিতির অধিবেশন শেষ হওয়ামাত্র চলে আসব: আমাকে দেশ দেখার জন্য বা অন্য কোন কারণে সেখানে অধিক দিন থাকবার জন্য অনুরোধ করা হবে না।

নিমন্ত্রণ টেলিগ্রামেও এসেছিল এবং কলকাতার সোভিয়েট কনস্যুলেট থেকে তাঁদের প্রতিনিধির মারফতও এসেছিল। কনস্যুলেটের প্রতিনিধি শুধু একবার বলেছিলেন, যাচ্ছেন, আমাদের দেশটা ঘুরে দেখবেন না? এখান থেকে যাঁরা যান, তাঁরা ত সকলেই এ আগ্রহ প্রকাশ করেন।

আমি উত্তর দিয়েছিলাম, এ আগ্রহ মানুষমাত্রেরই পক্ষে স্বাভাবিক। আমারও এ আগ্রহ নেই তা নয়, কিন্তু আমার পক্ষে বর্তমানে বেশী দিন বাইরে থাকা কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়। পরবর্তী কালে কোন সময়ে রাশিয়া গেলে অবশ্যই দেখব।

ওই সর্ত স্বীকার করে তাঁরা আমাকে চিঠি পাঠালেন পরদিন। পাসপোর্ট পরবর্তী অধ্যায়। পাসপোর্ট পেতে বাধা পড়ল। রিজিওন্যাল পাসপোর্ট অফিসার বললেন, সাধারণভাবে দেশভ্রমণ বা সাধারণ অন্য কোন উদ্দেশ্যে যাওয়ার ব্যাপার হলে তিনি পাসপোর্টে যাওয়ার অনুমতি দিতে পারেন, কিন্তু কোন আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ব্যাপারে দিল্লির খাস বৈদেশিক দপ্তরের সম্মতি বা

অনুমতি ব্যতিরেকে তাঁর দেবার অধিকার নেই। তিনি আমাকে দিল্লিতে তার করবার জন্য পরামর্শ দিলেন। সরাসরি দিল্লির সঙ্গে যোগাযোগ করে পাসপোর্ট পেলাম। যাত্রার সময় ২৫শে মে রাত্রি সাড়ে দশটায় ; যেতে হবে ডাকবাহী প্লেনে, নাগপুর হয়ে।

২৫শে মে, ভোরবেলা এমনই ঘটনা ঘটল যে, আমার কন্যার অস্ত্রোপচার এক ঘণ্টার মধ্যেই অবশ্যকরণীয় হয়ে উঠল। এবং বেলা সাতটায় হাসপাতাল থেকে সংবাদ পেলাম অপারেশন হয়ে গিয়েছে ; কন্যা তাঁর নবজাত কন্যাসহ ভালই আছেন। দৌহিত্রীর নামকরণ করলাম—লালী। লাল রাশিয়ায় যাত্রার দিন ওর জন্ম, সেই স্মৃতিটুকু ওই নামের সঙ্গে জড়িয়ে যাক। বিকেলে হাসপাতালে কন্যাকে দেখে তার সম্মতি এবং জামাতার সম্মতি (জামাই ওখানকারই ডাক্তার) নিয়ে রাত্রি সাড়ে দশটায় রওনা হলাম।

প্লেনে উঠে পৃথিবীর বিস্ময়কর পরিবর্তনের কথা মনে হল, এবং মনে হল নিজের জীবনের এই কল্পনাতীত আশ্চর্য পরিণতির কথা। পৃথিবী ক্ষুদ্র হয়ে গিয়েছে মানুষের বিজ্ঞানবুদ্ধির কল্যাণে ; ঘাতে-সংঘাতে ইতিহাসের গতিতে পৃথিবীর দেশদেশান্তরে মানুষের মধ্যে চৈতন্যময় জীবনের সেই অমোঘ মিলনাভিপ্রায় স্পষ্ট এবং প্রবল হয়ে উঠেছে, যাকে আমরা ভারতবাসীরা বলি ক্ষুদ্র এবং খণ্ডের বৃহৎ অখণ্ডমণ্ডলে পূর্ণ হবার অভিপ্রায়, যার জন্য আমি ছুটে চলেছি। দু দিনে অতিক্রম করব বহু সহস্র ক্রোশ ; মিলিত হব বহু দেশের প্রতিনিধির সঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে ভাবছিলাম নিজের ইতিহাস। সামান্য এক পল্লীগ্রামের মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান, কীভাবে এই বিরাট কর্মচক্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছি! নিজের জীবনের পুণ্যের মধ্যে এইটুকু আমি জানি যে, আমার কর্মজীবনে ফাঁকি কখনও দিই নি ; আর অসৎ বলে যা জেনেছি, তাকে কখনও প্রশ্রয় দিই নি। এবং আমার জীবনে যা-কিছু জেনেছি, তা প্রশ্নের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে প্রত্যক্ষভাবে জেনেছি। আমি পড়ে শিখি নি,

যা জানি নি, জীবনে আচরণের মধ্যে উপলব্ধি করে শিখেছি জেনেছি। সেই হেতু আমি অনেকের চেয়েই কম জানি। এর দামের তফাত অবশ্যই আছে। কিন্তু শুধু তার জোরেই কি এই এত মূল্য আমি পেলাম?

নাগপুরে এসে মনটা দমে গেল। একটা দুর্ঘটনা ঘটল চোখের সামনে।

প্রচণ্ড গরম। রাত্রি প্রায় দেড়টা। এরোড্রোমের বাড়ির সামনে খোলা ময়দানে যাত্রীরা সারি-সারি-পাতা আরাম-চেয়ারে বসে আছেন। আড়াইটে তিনটেতে আবার প্লেন ছাড়বে। চার জায়গার যাত্রী একত্রিত হয়েছে। কলকাতা-দিল্লি-বম্বে-মাদ্রাজ চার জায়গা থেকে চারখানা প্লেন এসেছে ডাক নিয়ে। নাগপুর থেকে আবার আপন-আপন ডাক নিয়ে ফিরবে। প্লেন থেকে যাত্রীরা নামবার আগেই প্রত্যেককে একখানি করে কুপন দেওয়া হয়, যে কুপন দিয়ে যাত্রীরা এরোড্রোম রেস্তোরাঁয় পছন্দমত ব্রেকফাস্ট খেতে পারেন। এই রাত্রে ব্রেকফাস্ট খাওয়া আমার কাছে শুধু অশোভনীয়ই নয়—ভারতীয় মতানুযায়ী এটা রাক্ষসাচার। রাত্রি নটায় খেয়ে আবার দুটোয় খাওয়া? উদরে কোন বহ্নি আছে কে জানে! কিন্তু আশ্চর্য! সব ভারতীয়ই ছুটলেন। আমি বসে রইলাম। আড়াইটের সময় তৃষ্ণা অনুভব করলাম। ভাবলাম একটু চা খাব বা জল খাব। রেস্তোরাঁয় চায়ের অপেক্ষায় বসে খাওয়া দেখলাম। আমার টেবিলে একজন দিল্লিফেরত বাঙালী দিব্য পূর্ণ ব্রেকফাস্ট খেয়ে ঢেকুর তুলে উঠে গেলেন। চা খেয়ে বেরিয়ে লাউঞ্জে এসে দেখি এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক করোনারী বা সেরিব্রেল থ্রম্বসিসে আক্রান্ত হয়ে একখানা চেয়ারে নিঃস্পন্দ নিথর হয়ে গিয়েছেন। চক্ষুদুটি স্থির, অনর্গল ঘামছেন, দু পাশে দু জন বন্ধু বুকে হাত বুলাচ্ছেন এবং কাতরভাবে ডাকছেন—মিঃ—মিঃ—মিঃ—। একজন নাড়ী দেখছেন এবং হতাশভাবে ঘাড় নাড়ছেন।

শুনলাম রেস্তোরাঁয় খেয়ে বেরিয়ে আসবার পথে কাতর হয়ে চেয়ারে বসে পড়ে এমনি হয়ে গিয়েছেন। মনটা খারাপ হয়ে গেল। সেখান থেকে সরে এলাম। ভদ্রলোক আমাপেক্ষা বয়সে প্রবীণ। কর্মের তাড়নায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। হঠাৎ পথের মধ্যে এই পরিণতি। আরোগ্য-নিকেতনে এ কথা আমি বলেছি। মৃত্যু এইভাবে জীবনের সর্বাপেক্ষা রুচিকর বস্তু বা কর্মের সূত্র ধরে মানুষকে এসে আক্রমণ করে। নিজের সঙ্গে মেলালাম। নিজেকে তিরস্কার করলাম। বললাম, তুমিও ত তাই। তুমিও ত এই ভাবেই ছুটেছ।

এরোড্রোমের লাউড স্পীকারের আওয়াজ শুনলাম, প্যাসেঞ্জারদের কেউ যদি ডাক্তার থাকেন, তবে তিনি অনুগ্রহ করে অবিলম্বে লাউঞ্জে এসে একজন অসুস্থ যাত্রীকে সাহায্য করুন। প্লিজ! প্লিজ!

লাউঞ্জের দিকে আবার ফিরলাম। তখন দেখলাম স্ট্রেচার আনা হয়েছে। তাঁকে স্ট্রেচারে তোলা হচ্ছে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে। ওদিকে আবার লাউড স্পীকার কথা কইল। কলকাতার যাত্রীরা সর্বাপেক্ষা পুবদিকের প্লেনে গিয়ে চড়ুন। তার পরেরটা বোম্বাইয়ের। তারপরেরটা মাদ্রাজের। সব শেষে পশ্চিম দিকেরটা দিল্লি।

ভারাক্রান্ত হৃদয়েই ফিরলাম। দিল্লির প্লেনে গিয়ে উঠলাম। নতুন ভাইকাউন্ট প্লেন। চমৎকার প্লেনখানি। যেমন গঠনসৌন্দর্য তেমনি আরামপ্রদ। তেমনি শব্দ কম।

ভাইকাউন্ট উড়ল। এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লাম। জেগে যখন উঠলাম, তখন ঊর্ধ্ব শূন্যলোকের পূর্ব দিগন্তে সূর্যোদয় হচ্ছে। সে কী বর্ণাঢ্যতা! ক্ষণে ক্ষণে চকিতে চকিতে শূন্যলোকে রঙের পর রঙের তুলি চলছে যেন, এরই মধ্যে শূন্যলোকেই মুহূর্তে মুহূর্তে কলায় কলায় জবাকুসুমসঙ্কাশ সূর্যমণ্ডল আবির্ভূত হলেন। প্রণাম করলাম।

ওই দিকেই তাকিয়ে ছিলাম। হঠাৎ প্লেনের বেগ কমল। দিল্লি আসছে। এর আগে দিল্লিতে এসেছি অনেকবার, কিন্তু প্লেনে এই প্রথম। আকাশ থেকে দিল্লি বড় সুন্দর। মস্কো থেকে ফিরবার সময় রাত্রে নেমেছি ; রাত্রের দিল্লির শোভা আরও মনোরম। এবং আকাশ থেকে দিল্লির মত সুন্দর কোন শহর আমার চোখে ঠেকে নি। মস্কো অপরূপ শহর। কিন্তু আকাশ থেকে দিল্লির সৌন্দর্য অনেক বেশী।

মানুষ হিসেবে আমি যে এখনও পাড়াগেঁয়ে সে কথা পূর্বাহ্ণে স্বীকার করাই ভাল। কোন্‌টা পালাম এরোড্রোম আর কোন্‌টা সফদরজঙ্গ এরোড্রোম তা আমি সঠিক এর আগে জানতাম না। নেমেছিলাম পালামে। বন্ধুবর অনিল চন্দের বাড়ি এসে বললাম সফদরজঙ্গ থেকে আসছি। ট্যাক্সি ভাড়া লেগেছে দশ টাকা। মিটার না-দেখেই ভাড়া দিয়েছি। সিলেটি অনিলবাবু 'রেঢ়ো' বলে গাল দিলেন। কিন্তু কাবুল রওনা হওয়ার দিন সফদরজঙ্গ থেকে যেতে হল, ভুল তখন ভাঙল। অনিলবাবু সঙ্গে ছিলেন, আবার একবার গাল দিলেন। দিল্লিতে পৌঁছে যতই যাত্রার সময় এগিয়ে আসতে লাগল ততই মনের বল জলস্রোতের মুখে-পড়া শক্ত মাটির ঢেলার মত নরম হয়ে গলতে লাগল।

দিল্লি থেকে ডাঃ মুল্‌ক-রাজ আনন্দ এবং আমার একদিনেই যাবার কথা। কিন্তু প্লেন স্বতন্ত্র। অন্তত কাবুল পর্যন্ত। মুল্‌ক যাবেন ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনসের প্লেনে, আমি যাব আফগান এয়ারলাইনস আরিয়ানার প্লেনে। মুল্‌ক চলে গেলেন, আমার প্লেন সেদিন আসে নি বলে যাওয়া হল না। অবশ্য আসে নি সে এক হিসেবে ভালই হয়েছিল। কারণ সে দিনটার প্রায় সাত-আট ঘণ্টা এমনি অসুস্থ ছিলাম যে, বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলাম বিছানায়। ডাক্তার দেখে ভরসা দিলেন, কয়েকটা ওষুধের ব্যবস্থা করে গেলেন। তাতেই চাঙ্গা হয়ে উঠলাম এবং ডজনদুয়েক

ট্যাবলেট সঙ্গে নিয়ে পরদিন শূন্য মার্গে পাড়ি জমালাম। ডাকোটা প্লেন— তার উপর যেন কিঞ্চিৎ নড়বড়ে।

অমৃতসর থেকে কাবুল পর্যন্ত বিশেষ করে সীমান্তের পার্বত্য অঞ্চলের বায়ুস্তর অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ, এয়ার-পকেটে ভরা। প্রচণ্ড বাম্পিং শুরু হল। সে যেন প্লেনখানাকে নিয়ে কেউ লোফালুফি শুরু করলে। যাত্রী বেশী ছিল না, মাত্র পাঁচ জন। প্লেনের পাইলট ক্রু এর সবাই ভারতীয়, শুধু স্টুয়ার্ড মহবুব আফগান; টকটকে রাঙা চেহারা, নীল চোখ,—ফিক্ ফিক্ করে হাসে। জনদুয়েক বমি শুরু করলে, মহবুব পাশে দাঁড়িয়ে ফিক্ ফিক্ করে হাসতে লাগল। আমার এয়ার-সিক্‌নেস হয় না। চীনে এর থেকেও বেশী রকমের বাম্পিং-এ আমি ঠিক ছিলাম এবং শেষে এরোড্রোমে পৌঁছে প্লেনের পাইলট ক্রু প্রভৃতিদের কাছে অনেক সাবাসই শুধু নয়, একটা ব্যাজও পেয়েছিলাম। যাই হক, কাবুলে পৌঁছে খবর পেলাম, ডা. আনন্দ আজ সকালে তাসকেন্দ রওনা হয়েও পথ থেকে ফিরে এসেছেন—আকাশের অবস্থা খারাপ থাকায় প্লেন যায় নি। খুশী হলাম। একসঙ্গে যেতে পারব। কাবুলের এরোড্রোমে দাঁড়িয়ে চারদিকে দৃষ্টিপাত করে যেন সম্মোহিত হয়ে গেলাম। তুষারাবৃত হিন্দুকুশের চূড়াগুলি পশ্চিমের রক্তাভ সূর্যের ছটায় যেন একটি বিরাট জ্যোতির্মণ্ডলের সৃষ্টি করেছে। অপরূপ—অপরূপ!

কাবুল শহরের ভূমিপ্রকৃতিও মনোরম। সবুজ ক্ষেত্র, ফলের বাগান, চারিদিকে একটা ঘুমন্ত পুরীর মত আভাস—একটা আশ্চর্য মনোভাবের সৃষ্টি করে। এখনও যেন এখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর কালদেবতা সেই কালের পোশাক-পরিচ্ছদ আভরণ পরে সেই কালের নৃত্যভঙ্গিতে নৃত্য করে সেকালের সব কিছুকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। এরোড্রোমটা যেন একালের একটা ফোঁটা এসে ছিটকে'

পড়েছে। গাধা, খচ্চর, ঘোড়ার পিঠে মাল চাপিয়ে তার উপর কাবুলিওয়ালারা চেপে চলেছেন। সেই ঢিলেঢালা পোশাক-পরা কাবুলীরা হেঁটে চলেছেন এবং গানও গাইছেন। সম্পন্ন মেয়েরা গাউন স্কার্ট পরেন—হাই-হিল জুতোও পরেন, কিন্তু তার উপর পরেন বোর্খা। সাধারণ গৃহস্থদের মেয়েদের পরনে পাজামা-পাঞ্জাবি। পথের পাশে সেই পুরনো কালের মাটির দেওয়াল, মাটির ছাদ, চারিপাশে দুর্গের গম্বুজের মত গম্বুজওয়ালা বাড়িঘর। অনেকক্ষণ স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে ছিলাম যেন। চারপাশের পাহাড়ে পাহাড়ে যেন অশ্বক্ষুরধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। দূরান্তের পর্বতশৃঙ্গটিকে বুদ্ধমূর্তি বলে মনে হচ্ছে। মনের মধ্যকার ইতিহাসের স্মৃতি বাস্তব দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে আবছায়ার মত বাইরে ফুটে উঠতে চাইছে। মাঠ এখন গমে ভরা; গম এই পাকতে শুরু করেছে। নালায় নালায় জল আসছে।

আরিয়ানা হোটেল নতুন হোটেল; সেই হোটেলে তুলে দিল। হোটেলটা সবে তৈরী হয়েছে। বন্দোবস্ত সব রকমেরই আছে—কিন্তু কোনটাই ঠিক সম্পূর্ণ নয়। বয়েরা একটা ঘরে হল্লা করছে, ডাকলে সাড়া দেয় না। ইলেকট্রিক বেল নেই। চা এ বেলা চাইলে ও বেলা মেলে। গোটা হোটেলটায় শতখানেক লোকের থাকবার ব্যবস্থা কিন্তু লোক মাত্র ছ-সাত জন, তাতেও এই অবস্থা। যাই হক ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ভারতীয় দূতাবাসের কর্নেল নরেন্দর সিং এবং মুল্ক এসে আমাকে তাঁদের ওখানে নিয়ে গেলেন। কর্নেল সিং নিজে একজন লেখক; তাঁর স্ত্রীও লেখিকা। তিনি কবি। ওঁদের ওখানে সন্ধ্যাটা পরমানন্দে কাটিয়ে হোটেলে ফিরলাম রাত্রি দশটায়। পরদিন সকাল আটটায় রাশিয়ান প্লেন ছাড়বে, তাসকেন্দ অভিমুখে। তাসকেন্দে প্লেন বদল করে জেট-প্লেন পাব। তাসকেন্দ থেকে মস্কো প্রায় দু হাজার মাইল। ৩ ঘণ্টা ৪০ মিনিটে পৌঁছে দেবে।

রাত্রে আমার ইষ্ট মাতৃদেবতাকে স্মরণ করে বললাম, অভয় দাও—নির্ভয় করো।

কাবুল থেকে তাসকেন্দ সোভিয়েট সাধারণ প্লেনে চার ঘণ্টা সাড়ে চার ঘণ্টার পথ। গোটা হিন্দুকুশ পর্বতশ্রেণীর উপর দিয়ে যেতে হবে। প্রতিটি সিটের জন্য অক্সিজেন গ্যাস-মাস্কের ব্যবস্থা রয়েছে। প্লেনখানি যাত্রীতে প্রায় ভর্তি। আমরা দু জন ছাড়া সকলেই শ্বেতাঙ্গ। ভেবেছিলাম রাশিয়ান সকলে। কিন্তু পরে জানলাম—রাশিয়ান দু-চার জন। বাকী সকলেই অন্য দেশের। আশ্চর্যের কথা, আমেরিকান বেশী। একজন সুইডিশ ডাক্তার কাবুলে এক বৎসর ইউ.এন.ও-র তরফ থেকে কাজ করে দেশে ফিরছেন। সঙ্গে তরুণী স্বর্ণকেশী কন্যা। একজন আমেরিকান অধ্যাপক। এদের সঙ্গে মুল্‌ক সহজেই আলাপ জমিয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে গেল। কয়েকটি আমেরিকান দম্পতি। সঙ্গে একটি করে বাচ্চা। একজন একক আমেরিকান। এ ভদ্রলোক আশ্চর্য উৎসাহী এবং পরোপকারী।

প্লেন উড়ল। চারিদিকেই পাহাড়। রুক্ষ ধূসর, জনবসতিহীন। তারই মধ্যে মধ্যে আঁকাবাঁকা নদীর দুই পাশের সমতল ভূমি সবুজ। সেইখানে মানুষের বসতি। ওই মাটির দেওয়াল মাটির ছাদের ঘর। ক্রমশ পর্বতমালার মৌনগম্ভীর তুষারাবৃত পর্বত-শীর্ষগুলি এগিয়ে এল নবীন সূর্যের রৌদ্রচ্ছটায় বরফের সুবিস্তীর্ণ আবরণ-গলানো রূপোর মত ঝলমল করে উঠল। সে এক আশ্চর্য দীপ্তি, আশ্চর্য রূপ এবং সে কী স্তম্ভিত করা মহিমা! মাইলের পর মাইল, যত দূর দৃষ্টি যায়। প্লেনের স্টুয়ার্ড এসে মাস্ক পরতে অনুরোধ করলেন। মনে হল কী হবে না-পরলে দেখা যাক না! মুল্‌ক নিষেধ করলে। মাস্ক পরে জানালার ধারে বসে রৌদ্র-

করোজ্জ্বল বিস্তীর্ণ তুষাররাশির দিকে চেয়ে রয়েছি, এমন সময় দুটো মাছি (কাবুলে মাছি বড় বেশী, সেখানেই প্লেনে ঢুকে উড়ছিল) জানালার কাছে এসে বারদুয়েক মাথা ঠুকে টুপটুপ করে মরে পড়ে গেল। অক্সিজেনের প্রয়োজনীয়তা বুঝলাম।

এক ঘণ্টার উপর প্লেন উড়ে চলল হিন্দুকুশ পার হয়ে। তারপর শুরু হল মরুভূমির মত পামির। মাস্ক খুলে ফেললাম। ধু ধু করছে তরঙ্গায়িত বালুর স্তূপ। দিগন্ত ধূসর ধূমল আবরণে ঢাকা। চোখ ক্লান্ত হয় না, শিউরে ওঠে। বিন্দু-বিন্দু সবুজও দেখা যায় না। অনেকক্ষণ পর সবুজ বিন্দু দেখা গেল। গুল্ম জন্মেছে। প্রাণের আশ্চর্য শক্তি। সে এর মধ্যেও জন্মেছে এবং বেঁচে রয়েছে। জল হয়তো মাটি থেকে পায়ই না। বাতাস থেকে যে রসটুকু পায় তাই নিয়ে সে বেঁচে থাকে। আশ্চর্যের উপর আশ্চর্য! কালো-কালো গোল আকারের ঘর। এক এক জায়গায় মাত্র দশটি-বারটি। মানুষ! এর মধ্যেও মানুষ বাস করে! মনে মনে প্রণাম করলাম ভগবানের প্রাণময় রূপকে। মনে হল, মাথার উপরে ওই অনুকূল তাপ ও দীপ্তিময় সূর্যদেবতা যতক্ষণ কেন্দ্র-বিন্দুতে স্থির আছেন, যতক্ষণ পৃথিবীর বায়ুস্তর কল্যাণময় ও স্নিগ্ধ এবং যতক্ষণ এই সজলা মৃত্তিকাময়ী অপরিসীম উপাদানগর্ভা অজরা ধরিত্রী তাঁকে উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ণে নিয়মিত প্রদক্ষিণ করছে, ততক্ষণ তার ধ্বংস নেই। যত বার ধ্বংসের ভস্মস্তূপে সে চাপা পড়বে, তত বার সে সেই ভস্মস্তূপ ঠেলে নবজীবনে নিজেকে প্রকাশিত করবে। সূর্য যতক্ষণ আছেন, ততক্ষণ প্রাণ অমৃত-শক্তির অধিকারী, সে মৃত্যুঞ্জয়। ভাবনা শেষ হতে না-হতে এল মরুর শেষ; আঁকাবাঁকা গতি বিশাল এক নদী। জল চকচক করছে। ওপার থেকে সবুজের সমাবেশ। চোখ-মন-প্রাণ জুড়িয়ে গেল।

হঠাৎ চোখে পড়ল সোজা একটি জলধারা। ক্যানেল!

প্লেন নামতে লাগল। রাশিয়ার ভূমিতে প্রবেশ করেছি। সীমান্তের এরোড্রোম আসছে। দেখতে দেখতে নেমে পড়ল। কোন বাঁধানো রুজওয়ে নেই, শক্ত মাটির উপর নেমে এসে থামল। তিন দিকে—মাইল খানেক দূরে দূরে সারি-সারি মাটি বা বালির স্তূপ এরোড্রোমটাকে যেন বেষ্টন করে রয়েছে। পূর্বদিকে ঘন গাছের সারি-দিয়ে-ঘেরা ছোটখাটো কয়েকখানি ঘর। তার মধ্যেই সব। কাস্টমস, রেস্তোরাঁ, ওয়্যারলেস, টেলিফোন প্রভৃতি অন্যান্য ব্যবস্থা। আমাদের পাসপোর্ট, হেল্‌থ সার্টিফিকেট পরীক্ষা হল। কার সঙ্গে কত টাকা সোনা রূপা আছে, তার ডিক্লারেশন দিতে হল। অল্পেই হয়ে গেল। খুব কড়াকড়ি মনে হল না। এরপর গেলাম খাবার জন্য। কাবুলেই স্নান ইষ্টস্মরণ করে বেরিয়েছিলাম, কিন্তু খেতে পারি নি, এত সকালে চা ছাড়া কিছু খেতে অভ্যস্ত নই আমি। ভেবেছিলাম—প্লেনে ব্রেকফাস্ট দেবে। কিন্তু রাশিয়ান প্লেনে এই দিক দিয়ে ব্যবস্থা ভাল নয়। অন্তত আমি যতটুকু দেখেছি তাতে নয়। ওই প্লেন ছাড়বার সময় একটা-দুটো করে লজেঞ্জেস ছাড়া আর কিছুই দেয় না।

খাবার ঘরে ডিম, রুটি, মাংস, মাখন, বিস্কুট এবং লাল চা যথেষ্ট। মাংস খাই না। ডিম রুটি এবং লাল চা খেলাম। ওই সুইডিস পিতাপুত্রী আমাদের টেবিলে বসেছিলেন। মুল্‌ক অল্পক্ষণের মধ্যেই তরুণীটির সঙ্গে বেশ মিষ্ট পরিহাসরসের আদান-প্রদানের মধ্যে চমৎকার অন্তরঙ্গ হয়ে গেল। মুল্‌কের এই মনোরঞ্জনের এবং অন্তরঙ্গতা অর্জনের ক্ষমতা অদ্ভুত। ইউরোপীয়েরাও এত পটু নয়। বেশ কৌতুক-পরিহাসের বাণ-কাটাকাটি চলছিল ; মেয়েটির কপোলে লাল আভা চমকে উঠছে। বাপ নীরব, তবে মধ্যে মাঝে হাসছেন। আমি অবাক হয়ে দেখছি। হঠাৎ দপ করে দমকা হাওয়ায় আলো নেভার মত সব

নিভে গেল। একজন রাশিয়ান এসে ওই সুইডিস পিতাপুত্রীকে বললেন, আপনাদের একবার আসতে হবে। কিছু প্রশ্ন আছে আমাদের।

মেয়েটি মুহূর্তে বিবর্ণ হয়ে গেল, প্রশ্ন? কী প্রশ্ন?

বিশেষ কিছু নয়। হেল্‌থ সার্টিফিকেট সম্পর্কে কয়েকটা প্রশ্ন।

কেন? আমাদের ত সব ঠিক আছে।

বেশ ত, সেই কথাই বলবেন।

বলবার প্রয়োজন কী? সব ত লেখাই আছে।

তবুও যেতে হবে। যাঁরা কর্তা তাঁরাই জানেন এসবের গুরুত্ব। আমি জানি না। তাড়াতাড়ি করুন। নইলে প্লেন চলে যাবে, আপনাদের আটকে থাকতে হবে।

চলে গেল সে। সব কথাবার্তাই হল ভাঙা চলনসই ইংরিজীতে। যেখানে আমিও নিজেকে পণ্ডিত বলতে পারি। এরপর বারকয়েকই মেয়েটি শুকনো মুখে শুকনো গলায় কাকে জানি না—হয়ত নিজেকেই—প্রশ্ন করলে—

কেন? কিসের প্রশ্ন? প্রশ্ন কী আছে?

মুল্‌ক সান্ত্বনা দিয়ে বলল, আগে থেকে কেন ভয় পাচ্ছ? দেখ না হয়ত কিছুই নয়। যাও না।

বাপ লোকটি অতি স্বল্পভাষী। তিনি নীরবেই কন্যার হাত ধরে চলে গেলেন। আবার দূত এসে দাঁড়াল। এবার এক আমেরিকান দম্পতি। একে একে প্রায় সকলকেই ডাক পড়ল। বিদেশীর মধ্যে আমি ও মুল্‌ক, এবং কজন রাশিয়ান শুধু বাদ রইলাম। অনেকক্ষণ পর বাইরে বেরিয়ে এলাম। সামনের কুঞ্জবনের স্নিগ্ধ পরিবেশের মধ্যে বসে রইলাম মরুভূমির দিকে চেয়ে। বাগানে ছোট একটা বিলিয়ার্ড টেবিল পাতা, সেখানে এরোড্রোমের কর্মচারী যাঁদের কাজ নেই তাঁরা

খেলছেন। কারও সম্পর্কে ঔৎসুক্য নেই, ভ্রূক্ষেপ নেই। কিছুক্ষণ পর একে একে সব বেরিয়ে এলেন। আমেরিকান অধ্যাপকটি বললেন, অকারণ যত বাজে প্রশ্ন। এ ইনজেকশন ও ইনজেকশন নিয়েছ? লেখা থাকলেও জিজ্ঞাসা করে। হাতের ইনজেকশনের দাগ বা গুটি দেখালেও মানতে চায় না। অথচ আমরা মাত্র এ দেশের মধ্য দিয়ে দেশান্তরের যাত্রী। ট্রানজিট প্যাসেঞ্জার। কেউ এ দেশে থাকব না। বড় জোর দশ-বার ঘণ্টা কি চব্বিশ ঘণ্টা। হাসতে হাসতেই বললেন অধ্যাপক। শুধু অধ্যাপকটিই নয়, প্রায় সকলেই। এমন কি ওই পিতাপুত্রীও বেরিয়ে এলেন হাসিমুখে। অবশ্য বিপদ কেটে গেলে হাসিই তার স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। তবুও আমাদের চোখে এ হাসি একটু বেশী হাসি, সুতরাং অসাধারণ। অন্তত আমাদের কাছে ত বটেই।

অবশ্য এইখানেই জানতে পারলাম, এঁরা কেউ রাশিয়ার যাত্রী নন, সকলেই রাশিয়ার ভিতর দিয়ে অন্যান্য নানা দেশে চলে যাচ্ছেন। পূর্ব থেকে পশ্চিমে, হংকং থেকে কলকাতা দিল্লী কাবুল তাসকেন্দ মস্কো হয়ে পথটাই হল সোজা, কম দূরত্বের পথ; এবং তাসকেন্দ থেকে রাশিয়ার জেট বিমান অন্য দেশের বিমানের চেয়ে অর্ধেকেরও কম সময়ে সুদীর্ঘ দূরত্ব পার করে দেয়। কেউ যাবে স্টকহোম, কেউ ফিনল্যাণ্ড, কেউ জার্মানি, কেউ প্যারিস, কেউ বা ইংল্যাণ্ড। রাশিয়ায় এখন পূর্বের বাধানিষেধ নেই; বিমানপথের ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সে দুয়ার খুলেছে।

যাই হ'ক, প্লেন আবার উড়ল। ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যেই তাসকেন্দে এসে উপস্থিত হলাম। বিরাট বিমানবন্দর। সারি সারি প্লেন দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের প্লেন নামল। যেখানে নামল তার পাশেই বাঁকানো-ডানা প্রপেলারহীন (অন্তত বাইরে বেরিয়ে নেই) বিরাট প্লেন দাঁড়িয়ে। ওইটেই জেট প্লেন।

ওখানাই মস্কো যাবে। সামনেই গ্রীক মন্দিরের স্থাপত্যরীতিতে গঠিত সুন্দর এবং প্রকাণ্ড বন্দরনিবাস। চারি পাশে ফুলের বাগান। লোকেরা কাজ করছে। বন্দর-দালানের একটা দিক কাঁচ দিয়ে ঘেরা। অনেক লোকের প্রতীক্ষমাণ দৃষ্টি সেখানে সারি সারি ফুটে রয়েছে।

যাঁরা বিদেশের যাত্রী মস্কো যাবেন বা রাশিয়ার ভিতর দিয়ে অন্য দেশে যাবেন, তাঁদের বিশ্রাম বা প্রতীক্ষাগার অন্য যাত্রীদের থেকে স্বতন্ত্র। আমরা সেখানেই বসলাম। একটি আমেরিকান দম্পতির দুরন্ত ছেলে দাপাদাপি করে মাতিয়ে রেখেছিল ঘরখানা। একজন তরুণী এয়ার-হোস্টেস এসে আমাদের পাসপোর্ট নিয়ে গেলেন। অপর একজন চাইলেন হেল্‌থ সার্টিফিকেট। ওই হেল্‌থ সার্টিফিকেট নিয়ে আবার ওই আমেরিকান এবং সুইডিসদের ডাক পড়ল। আমরা দু জন বসেই রইলাম। ভেবেছিলাম এক-আধ কাপ চা অন্তত দেবে, কিন্তু তাও দিলে না। মুল্‌ক প্রত্যাশা করে-ছিল, এখানকার লেখকসঙ্ঘের কোন প্রতিনিধি অবশ্যই থাকবেন, কিন্তু তাঁদেরও কেউ ছিলেন না। ঘণ্টা খানেক পরে ডাক পড়ল প্লেনের। গিয়ে উঠলাম। ঘড়িটা ঠিক করে নিলাম। কাবুল টাইমের সঙ্গে এক ঘণ্টার মত তফাত। কাবুল টাইম ভারতবর্ষের সময় থেকে ঘণ্টাখানেক পিছনে। প্লেনে বসে আছি, প্লেন ছাড়ে না, নির্দিষ্ট সময় বোধহয় পার হয়ে গেল। এখনও আমেরিকান প্রভৃতি ট্রানজিট যাত্রীরা আসেন নি। সেই হেল্‌থ সার্টিফিকেটের ব্যাপার। এখানেও তারই পুনরাবৃত্তি।

বাইরে তাকিয়ে এরোড্রোমের লোকগুলিকে দেখলাম। লোকগুলি স্বাস্থ্যবান। এখানকার লোকদের গঠনে রঙে রাশিয়ার ছাপ। এদের পোশাক-পরিচ্ছদগুলিই দেখছিলাম তীব্র দৃষ্টিতে। রাশিয়ার লোকদের ভাল পোশাক-পরিচ্ছদ না-থাকার অভিযোগ আছে বাইরের জগতে। চীনে নীচের

লোকেদের পরনে জীর্ণ পোশাক দেখেছি। সাধারণভাবেও পোশাক-পরিচ্ছদে তালি এবং একঘেয়েমি দেখেছি। অভাবটা সেখানে স্পষ্ট। তাঁরা এ কথা স্বীকারও করেন। কাপড়ের উৎপাদন বাড়াবার আগ্রহের কথাও শুনেছি। তাই এখানকার লোকেদের পোশাক জুতো লক্ষ্য করে দেখছিলাম। ভারতবর্ষ থেকে রাশিয়ায় জুতো রপ্তানির কথা জানি। আমার চোখে কিন্তু পোশাক-পরিচ্ছদ খারাপ ঠেকল না। শ্রমিকদের যারা বাগানে কাজ করছিল, তাদের পোশাক পরিচ্ছন্ন এবং পর্যাপ্তই মনে হল। জুতো সকলের পায়েই রয়েছে। তাসকেন্দ এরোড্রোমে ফুলের সমারোহ। নানান বর্ণচ্ছটায় ঝলমল করছে। এখানে গোলাপ হয় খুব ভাল। আঙুর হয় প্রচুর এবং এখানকার তরমুজ খরমুজা নাকি মিষ্টতায় অতুলনীয়। সম্রাট বাবর এই প্রদেশের লোক। তিনি হিন্দুস্থানে সম্রাট হয়ে আঙুরের জন্য তত দুঃখ করেন নি—যত দুঃখ করেছিলেন এই তাসকেন্দী তরমুজ ও খরমুজার জন্য। অনেকে বলেন, এই দুঃখেই তিনি চেয়েছিলেন তাঁর কবর যেন হিন্দুস্থানে না-দেওয়া হয়, অন্তত কাবুলে নিয়ে গিয়ে দেওয়া হয়। সেখানেও আঙুর আছে, তরমুজ খরমুজা আছে, আনার আছে।

বসেই আছি প্লেনে, অন্তত আধ-ঘণ্টার উপর। তাসকেন্দের এরোড্রোম অত্যন্ত কর্মব্যস্ত। প্লেন আসা-যাওয়ার বিরাম নেই। আমাদের জেট প্লেনের সামনে আমাদের প্রতীক্ষাকালের মধ্যেই খান তিনেক প্লেন এল, খান তিনেক গেল। এই আসা-যাওয়ার ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত যেন অত্যন্ত সহজ। এই প্লেন নিয়ে কারবার যেন খুব সাধারণ কারবার। প্লেন নামছে, যাত্রীরা নেমে যাচ্ছে, পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে প্লেনখানা সরে যাচ্ছে। আবার একখানা আসছে। বা এসে যাত্রী বোঝাই নিয়ে চলে যাচ্ছে। সেও কয়েক মিনিটের ব্যাপার। আর প্লেন অনেক। জেট প্লেনই দাঁড়িয়ে আছে খানতিনেক। একখানা জেট প্লেন খুলে হয় পরিষ্কার বা

মেরামত হচ্ছে। বাইরে দেখে চোখ ক্লান্ত হল, ভিতরে চোখ ফেরালাম। বিরাট জেট প্লেন। ইঞ্জিনঘর ছাড়া তিনখানা ছোট কামরা এবং একখানা বড় কামরায় ভাগ করা। সাজসজ্জা অনেক। এমন কি সামনের দেওয়ালের গায়ে-আঁটা ব্রাকেটে পুতুল সাজানো। র‍্যাকে নানান্ সাময়িক পত্র।

তিনটি এয়ার হোস্টেস এক সময় এসে প্লেনে ঢুকলেন। একজন মধ্যবয়সী। অপর তুটি তরুণী এবং স্থন্দরী মেয়ে। তেমনি স্বাস্থ্যবতী। পোশাক-পরিচ্ছদে গলায় বিডের মালায় তাঁরা যেন একটু বিলাসিনী। একেবারে ফিনফিনে নাইলনের মত পাতলা কাপড়ের ফুলহাতা ব্লাউস, চমৎকার স্কার্ট, ঠোঁটে রঙ। তাঁদের পিছনে পিছনে বাকী যাত্রীরা এলেন। হাসতে হাসতেই এলেন, তবে এবার ভ্রূতে কুঞ্চন।—The same old questions. Rubbish!

আমাদের ঠিক সামনে বসলেন তু জন আমেরিকান, ওঁরা তু জনেই একা মানুষ। একজনের কাঁধে বেশ বড় আকারের একটি ক্যামেরা। সেটির প্রতি তাঁর অসাধারণ যত্ন। ক্যামেরাটি নামিয়ে রেখে বললেন, এইটে নিয়ে হাজার প্রশ্ন। My God! This can do no harm. What a—my God!

কথাগুলি ঘাড় ফিরিয়ে আমাদেরই বললেন।

মুল্‌ক একটু হেসে বললেন, The reason is the cold war, you see.

মুল্‌ক কথা কয় বেশী। বলতে আরম্ভ করলে থামে না। সে কি রস-রসিকতায়, হাস্য-পরিহাসে, কি তত্ত্বকথা-ব্যাখ্যায় হাঁটু টিপতে টিপতেই কথা শুরু করলে; এইবার হাঁটুর ব্যথা ভুলে হাঁটু টেপা বন্ধ করে তুই হাত নাড়বে। বেচারা বম্বেতে কোথায় কোন্ পাথর থেকে পড়ে হাঁটুতে আঘাত লাগিয়েছে। লাঠিতে ভর দিয়েই মস্কো চলেছে। লাঠি এবং হাঁটু ছেড়ে তুই হাতে পৃথিবীর মত কোন গোলাকার বস্তুর ইঙ্গিত ফুটিয়ে তুলে সে আরম্ভ করলে, You

see, these politicians of this world—of course with the honourable exception of our Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru—are—.

হঠাৎ সুন্দরী এয়ার-হোস্টেস এসে সামনে দাঁড়ালেন, প্লিজ জেণ্টলমেন—প্লিজ। হাতে অয়েল পেপারের একগোছা কিছু।

বুঝলাম এবার, প্লেন বিকল হলে বিপদের সময় আত্মরক্ষার জন্য কীভাবে লাইফ-জ্যাকেট পরতে হবে—এবং আর আর কী করতে হবে সেই সব বলবেন। মনে মনে বললেম, মিথ্যেই বলছ তুমি ওসব। কতকগুলো বাজে কথায় তোমার সুন্দর মুখের বাক্যের অপব্যয়। তখন এসব কিছুই কাজে লাগবে না। তার থেকে যদি একটু হাসির সঙ্গে কিছু খেতে দাও ত খুশী হই। অন্তত চা এক কাপ।

কিন্তু মেয়েটি বিপদের কথা কি লাইফ-জ্যাকেটের নামও উচ্চারণ করলে না। বললে, দেখ, জেট প্লেনের প্রচণ্ড গতির কথা তোমরা অবশ্যই শুনেছ। এখান থেকে মস্কো আমরা তিন ঘণ্টা চল্লিশ মিনিটে পৌঁছুব। (স্কাই মাস্টার বা সুপার-কনস্টেলেশনে অন্তত ৮।১০ ঘণ্টা লাগবে)। তিরিশ হাজার ফুট উপর দিয়ে যাবে। যাদের ফাউণ্টেন পেন রয়েছে, তাদের পেনের কালি এর ফলে ছিটকে বেরিয়ে যাবে। সুতরাং এই অয়েল পেপারের খাপে পুরে সেগুলিকে বেশ করে মুড়ে রাখলে নিরাপদ থাকবে। এবং উঠবার সময় বেল্ট দিয়ে নিজেদের আসনের সঙ্গে বেঁধে রাখতে অনুরোধ করছি। সিগারেট তোমরা খেতে পার। আসনের পাশেই অ্যাশ-ট্রে আছে।

প্লেনও গর্জন করে উঠল এই সময়। সকলেই অয়েল পেপারের খাপে ফাউণ্টেন পেন পুরতে ব্যস্ত হলেন। আর-একটি তরুণী লজেঞ্জসের থালা নিয়ে লজেঞ্জস বিলি করে গেলেন। আমি লজেঞ্জস রেখে সিগারেট ধরিয়ে আরাম পেলাম। অনেকক্ষণ

সিগারেট খাই নি। প্লেন উঠতে লাগল, কিছুক্ষণের মধ্যেই নীচের পৃথিবী মেঘের পর্দায় ঢাকা পড়ল। ত্রিশ হাজার ফুট সে, এভারেস্টের উচ্চতার চেয়েও এক হাজার ফুট বেশী। প্লেন তেত্রিশ হাজার ফুট উপরে উঠল। একটু মাথা ধরেছে। মাথা ধরা আমার একটা সাধারণ উপসর্গ। তার জন্য দু ডজন ট্যাবলেট সঙ্গে নিয়েছি। ওষুধের ব্যাগ সঙ্গেই রয়েছে। সেটা খুললাম। খুলে দেখি গোটা ব্যাগটা কোনপ্রকার চটচটে তরল পদার্থে ভিজে গিয়েছে। কী হল? দেখি দু আউন্স একটা শিশিতে গ্লিসারিন ছিল। ফাউণ্টেন পেনটা অয়েল পেপার দিয়ে মুড়েছি। ওটা মুড়ি নি। ব্যাগের ভিতরে ওটার ছিপি ঠেলে গ্লিসারিনের সবটাই সমস্ত কিছুকে গ্লিসারিনসিক্ত করে দিয়েছে।

চায়নায় শুকনো শীতে সর্বাঙ্গ ফাটতে আরম্ভ করেছিল। ভারতীয় দূতাবাসের শ্রীযুক্ত পি. কে. গুহের গৃহিণীর কাছে একটু গ্লিসারিন ভিক্ষে করে তবে বাঁচি। এবার সঙ্গে নিয়েও এই দশা হল। যাক গে ওষুধ খেয়ে একটু জল চেয়ে নিলাম। খেয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করলাম। প্লেনে সব সময়েই যাত্রীরা বড় জোর আধ ঘণ্টা মানুষ থাকে, নড়াচড়া করে, কথাবার্তা কয়, পড়ে শোনে—তারপর একান্ত অসহায়ভাবে এলিয়ে পড়ে। এতে দ্রুতগতিতে যাওয়ার সুবিধে আছে বটে, কিন্তু ভ্রমণের কোন আনন্দই নেই। পৃথিবীর বুকে রূপ-রস-গন্ধ-শব্দের নব নব বৈচিত্র্য; গরুর গাড়ি থেকে ট্রেন পর্যন্ত গতির বেগ অনুভবের শিহরণ। উল্লাস আছে, উত্তেজনা আছে। বাইরের প্রকৃতি এবং জীবনের সঙ্গে চোখের দৃষ্টির মাধ্যমে বিনিময় আছে। প্লেনের মধ্যে শুধু শব্দই আছে। আর কখনও বাম্পিংয়ের মধ্যে চকিতের জন্য গতি অনুভব করা যায়, কিন্তু সে অনুভূতি কষ্টদায়ক, আনন্দের বদলে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। কাজেই এই মহাশূন্যের মধ্যে ভিতরে বাহিরে স্থির মানুষ অবসাদে এলিয়ে পড়ে। ঘুম

ছাড়া নিষ্কৃতি নেই। পক্ষী ও পতঙ্গের ওড়ার আনন্দ মানুষের প্লেনে ওড়ার আনন্দের চেয়ে অনেক বেশী। সেখানে তারা নিজের সত্তায় স্বকীয় শক্তিতে অধিষ্ঠিত। এখানে মানুষে নিজের উদ্ভাবিত যন্ত্রের মধ্যে মানুষের সত্তা হারিয়ে মাটির পুতুল। আমি পাইলটের কথা বাদ দিয়ে বলছি। কারণ তার কথা জানি না। সে অবশ্যই যাত্রীদের চেয়ে অনেকখানি নিজের বীরত্ব, সাহস এবং কর্মতৎপরতায় জাগ্রত। অসীম ধৈর্য এবং স্থির বুদ্ধিতে বিশেষ সত্তায় অধিষ্ঠিত। কিন্তু তবুও ঐ যন্ত্রটা যেন তারও উপরে; কোন মুহূর্তে কোন কারণে সে বিকল হলে পাইলট আর তাকে আপন ইচ্ছায় পরিচালিত করতে পারে না। যাই হক, কথাটা এই যে, গতির প্রয়োজনে, প্রয়োজনের তাড়নায় মানুষ এরোপ্লেনে ওড়ে, অবশ্য দীর্ঘ ভ্রমণের ক্লেশ থেকেও অব্যাহতি আছে, কিন্তু আনন্দের আকাঙ্ক্ষায় মানুষ প্লেনে চড়ে না।

স্বাভাবিকভাবে ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম। ঘুম ভাঙল যখন তখন নীচের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ের অবধি রইল না। উপরে নীল, নীচে নীল, এক নীল আবরণের মধ্যে প্লেনখানা একটা অতিকায় ভ্রমরের মত গুঞ্জন করছে। পরক্ষণেই মনে হল, "ও, কাস্পিয়ান সী!"

আবার কিছুক্ষণ পর ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ বাম্পিংয়ে ঘুম ভাঙল। ঘড়ি দেখলাম। তিন ঘণ্টা প্রায় পূর্ণ হয়ে আসছে। মস্কো পৌঁছুতে আর এক ঘণ্টাও নেই। পাঁচ মিনিট খসে গিয়েছে এক ঘণ্টা থেকে। বার ঘণ্টা একনাগাড় প্লেনে চড়েছি। কিন্তু জেট প্লেনে নতুন চড়ে একটা অস্বস্তি আছে গোড়া থেকেই। মধ্যে মধ্যে মনে মনে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করছি। 'রক্ষা কর' বলি নি বললে একালে বীরত্ব প্রকাশ করা হয় বটে, কিন্তু 'রক্ষা কর' বললে তিনি রক্ষা করেন না জেনেও 'রক্ষা কর'

বলেছি। আমি তাঁকে সাধারণ জীবনে ডাকি, স্মরণ করি, নিজের জীবনের গ্লানি থেকে মুক্তি পেতে। ঈশ্বরসত্তা আমার কাছে সর্বমালিন্য সর্ব-অশান্তি-মুক্ত সত্তা। তাকেই আমি অনুভব করতে চেষ্টা করি। কিন্তু এমন অসহায় অবস্থায় 'রক্ষা কর' বলে ডেকে বসি। ঘড়ির দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছিলাম। এক ঘণ্টা থেকে পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট খসল।

প্লেন এখন চলছে—প্রচণ্ড মেঘ-সমাবেশের মধ্য দিয়ে। হঠাৎ নজরে পড়ল জানালার পাশের ফ্রেমের স্ক্রুগুলির মাথায় কেউ যেন কুটি-কুটি তুলো লাগিয়ে দিয়েছে। তুলো নয়, বরফ জমেছে। উঃ! বাইরের শীতের অবস্থা ভেবে শিউরে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে ভাবলাম, কোন কারণে যদি প্লেনের এয়ার-কণ্ডিশনিং বিকল হয়, তবে কী হবে? অক্সিজেন টিউব লাগাবার ব্যবস্থা আছে দেখলাম। হঠাৎ মনে হল প্লেনের গতি কম হয়ে গেল। ঘড়ি দেখলাম, এখনও পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাকী। পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগবে নামতে? ঠিক এই সময়টিতেই বোধ করি মিনিট খানেকের মধ্যেই এয়ার-হোস্টেস এসে বলল, আপনারা বেল্টগুলি অনুগ্রহ করে বাঁধুন।

চমকে উঠে আমিই প্রশ্ন করলাম, আমরা কি মস্কো এসে গেছি?

না। অন্য একটি এরোড্রোমে আমরা নামছি।

মস্কোতে পৌঁছুতে কতক্ষণ লাগবে এখান থেকে?

আর দু ঘণ্টা।

বলেই চকিতে সে চলে গেল। চমকে উঠেছে সকলেই। তিন ঘণ্টা হয়ে গিয়েছে। তিন ঘণ্টা চল্লিশ মিনিটে পৌঁছবার কথা। এখন বলে আরও দু ঘণ্টা লাগবে। ব্যাপার কী?

আমি জানালা দিয়ে দেখছি প্লেন মেঘরাশির মধ্যে যেন হারিয়ে গিয়েছে। মাটি নেই, আকাশ নেই, পুঞ্জ-পুঞ্জ মেঘের মধ্য দিয়ে

জলের মাছের মত চলেছে। কিছুক্ষণ পর মাটি দেখা গেল। কোন বনভূমি। বিস্তীর্ণ অরণ্যভূমি। প্লেন ঘুরছে। পাক খাচ্ছে। কোথায় নামবে এখানে? পাখার ধারের জানালায় মুখ রেখে আমি সব দেখছিলাম। ঘট করে একটা শব্দ হল। পাখার ভিতরে গুটানো সুদীর্ঘ ঠ্যাংটা চাকাটা নিয়ে বের হচ্ছে। কিন্তু নামবে কোথায়? ভিতরে তাকিয়ে দেখি সকলে মাটির পুতুল হয়ে গিয়েছে। আমাদের ডান দিকের সিটে একজন সোভিয়েট আর্মি অফিসার। সেও পুতুল। এয়ার-হোস্টেসরা অদৃশ্য হয়েছে। কারও গলায় স্বর বের হচ্ছে না। কেউ জিজ্ঞাসা করতেও পারছে না কী হয়েছে। প্লেনটা আবার উঠতে লাগল। চাকাদুটো আবার গুটোচ্ছে। কিছু হয়েছে। কী তা জানি না। তবে প্লেন নামতে গিয়ে নামতে পারছে না। চকিতে একবার সারা জীবন-সংসার মনের মধ্যে উঁকি মেরে চকিতে অদৃশ্য হয়ে গেল। মানুষ সব স্থির হয়ে আশ্চর্য ধীরতার সঙ্গে বসে আছে। আমারও কোন উদ্বেগ নেই। যা হবার হবে। আবার প্লেন নীচের দিকে মুখ করলে। নামছে। বন-বন-বন। ওই একটা শহর। পাক খেতে লাগল প্লেন।

চারিপাশেই বন। বোধ করি বনেরই অঞ্চল এটা। তারই মধ্যে এই শহর। প্লেন এত নীচে নেমে পাক খাচ্ছে যে, নীচের সব কিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। রেল লাইন - স্টেশন - কারখানা - বাড়ি-ঘর - পথঘাট সব। দেখেশুনে বেশ বড় শহর মনে হচ্ছে না। এবং সবই প্রায় কাঠের কারখানা। রাশি-রাশি চেরাই-করা কাঠের স্তূপ দেখা যাচ্ছে। তাদের টকটকে হরিদ্রাভ রঙ দেখে এক মুহূর্তেই চেনা যায়। এবারও আবার প্লেন নামতে গিয়ে না-নেমে উপরে উঠে গেল। মুহূর্তের জন্য আমার নাগপুরের সেই প্রৌঢ় ভদ্র-

লোককে মনে পড়ল ; যাঁকে অজ্ঞান অবস্থায় স্ট্রেচারে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। যে দিক দিয়ে মানুষ নিজের শক্তিকে সর্বাধিক ব্যয়িত করে, ক্ষয়িত করে, সে দিকে তার কামনা যত পরিশুদ্ধই হ'ক তার অন্তরালে অতি প্রচ্ছন্নভাবে থাকে একটি প্রবৃত্তির তাড়না ; এবং মৃত্যু সেই দিক থেকে অকস্মাৎ একদা এসে সামনে দাঁড়ায়, আত্মসাৎ করে। কে জানে আমার এই ছুটোছুটির পথে অকস্মাৎ খিল খিল করে হেসে উঠে সামনে মুহূর্তে নিজেকে প্রকট করে দাঁড়াবে না ?

ভাবতে ভাবতেই প্লেন এবার নেমে পড়ল, জানলার পাশেই ছিলাম—রুজওয়ে চোখে পড়ল, অতিকায় সারসের পায়ের মত লম্বা পাখনা সোজা হয়ে ছুঁই ছুঁই করছে ;—ছোট একটি ধাক্কার সঙ্গে মাটি ছুঁল। ছুটতে লাগল। ছুটতে ছুটতে হঠাৎ রুজওয়ে থেকে বাঁ দিকে বেরিয়ে ভিজে মাটির উপর চলতে শুরু করল এবং এক জায়গায় ব্রেক-কষার ধাক্কার মত বেশ একটি জোর ধাক্কা অনুভব করিয়ে থেমে গেল। দেখলাম চাকাটা প্রায় দু আনা মাটিতে বসে গিয়েছে। সামনে দেখি আমাদের দেশের গরুর গাড়ির চাকার চিহ্নের মত দুটি হাত খানেক হাত দেড়েক গভীর গর্ত সমান্তরাল রেখায় চলে গিয়েছে। চালক খুব রুখেছে। এই গতিতে এই বিপুলকায় বিমানকে পর পর ওই দুটি গর্ত পার হতে হলে তাকে মুখ গুঁজে পড়তে হত। গোটা প্লেনের যাত্রীদের কারুর মুখে কথা নেই। এয়ার-হোস্টেসরা অদৃশ্য। তাঁরা ইঞ্জিন-রুমে ঢুকে বসে আছেন। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। মিনিট কয়েকের মধ্যে গরম বোধ করলাম। ঘাম বের হচ্ছে। বোধ করি এয়ার-কণ্ডিশনিং ঠিক কাজ করছে না। ওদিকে বাইরে একটা বিচিত্র গঠনের মোটর এসে দাঁড়াল, তার সঙ্গে প্লেনে তেল ইত্যাদি দেওয়ার অন্য একটা মোটর। বিচিত্রগঠন মোটরটা থেকে লোহার দড়া-দড়ি বের হচ্ছে। এরোড্রোম-কর্মীদের বিশেষ পোশাক-

পরা কর্মীরা, ওই বসে-যাওয়া চাকাটা দেখছেন। আমরা ঘামছি। আমিই প্রথম বললাম—এ যে গরমে মরে যাচ্ছি! আমাদের নামতে দিক না। কথার প্রতিধ্বনি উঠল। কিন্তু কে উত্তর দেবে? কা কস্য পরিবেদনা। যাত্রীরাও পঙ্গু হয়ে গিয়েছেন, বেল্টের বাঁধা খুলতে সাহস করছেন না। আরও কয়েক মিনিট পর প্লেনখানা আবার গর্জাল এবং সামনের ওই গাড়ির চাকার দাগের গর্ত তুটোকে বাঁ পাশে রেখে—ডাইনে বেঁকে মোড় নিয়ে রুজওয়েতে ফিরে ওঠবার চেষ্টা করল। কিন্তু কয়েক গজ গিয়েই থেমে গেল এবং চাকাটা এবার বারো আনা বসে গেল—কর্ণের রথচক্রের মত। ওদিকে বাইরে ক্যাটারপিলার এল। দড়া-দড়ি এবার বাঁধা হল। অনুভব করলাম—ও বাঁধন আমাদেরও বাঁধছে।

এই সময়ে এতক্ষণে শ্রীমতী এয়ার-হোস্টেসরা এলেন। হাসিমুখে বললেন, দেখুন, বাইরে আপনাদের জন্যে বাস এসেছে। আপনারা ওই বাসে চড়ে এরোড্রোমে গিয়ে তু ঘণ্টা বিশ্রাম করুন। প্লেন তু ঘণ্টা পর ছাড়বে। জিনিসপত্র যার যা আছে—অর্থাৎ হ্যাণ্ডব্যাগ থাক, মাত্র আপনারা চলে যান। মাত্র তু ঘণ্টা। আমি ওষুধের ব্যাগটাও নিলাম না। ফ্লাস্ক ছিল একটা, সেটাও না। শুধু পাসপোর্ট টাকা ইত্যাদির পোর্টফলিওটা নিয়ে চলে গেলাম।

এরোড্রোম অনেক দূর। ঝিপ ঝিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে। বাসটা স্টার্ট নিয়ে কয়েক গজ গিয়ে কাদায় বসল। এতক্ষণে সকলের হাসি পেল। এরোড্রোমের কর্মীরা ঠেলে বাসটাকে রুজওয়ের উপর তুলে দিতে বাসটা চলতে শুরু করল। এরোড্রোমে এসে নামলাম। এবার আমাদের তদ্বিরে লাগলেন—এয়ার-হোস্টেসদের মধ্যে মহিলাটি। বাকী তু জনকে আর দেখা গেল না। নিপুণা গৃহিণীর মত স্নেহ প্রীতির সঙ্গে হাসিমুখে আশ্চর্য তৎপরতার সঙ্গে আমাদের খাওয়া-দাওয়া এবং রেস্ট-হাউসে সুবন্দোবস্তের মধ্যে থাকবার ব্যবস্থা করলেন। বাইরে বৃষ্টি, শীত বেশ। আমরা তাসকেন্দ-মস্কোর

পথ থেকে কয়েক শত মাইল উত্তরে এসে ট্রান্স-সাইবিরিয়ান এয়ার-লাইন্‌সের এক এরোড্রোমে নেমেছি। নামটা শুনেও ঠিক বুঝতে পারি নি, মুল্‌কের মত ইণ্টারন্যাশনাল লোকই ঠিক নামটা উচ্চারণ করতে পারছিল না ত আমি গেঁয়ো লোক, বুঝব কী? যদিও তখন বুঝেছিলাম কিন্তু এখন দেখছি মনে নেই, কারণ আমার নোট করা অভ্যেস আদৌ নেই। যাক, এরোড্রোমে নামবার সময়েই আমি বুঝেছিলাম যে, এ রাত্রি এখানেই স্থিতি। আমেরিকানরা কিন্তু আশা ছাড়ে নি। তারা দু ঘণ্টা ধরে বসেই আছে। বিশেষ করে মূল্যবান ক্যামেরাওয়ালা আমেরিকানটি। দু ঘণ্টা অতীত হয়ে গিয়েছে। আমাদের ঘড়িতে কাবুল টাইমে এগারটা বাজে প্রায়। এদের নটা। ঘুম এসেছে। আরামপ্রদ ঘরে—আরামপ্রদ হোটেলের মত ঘরে বেশ কম্বল মুড়ি দিয়েছি, মুল্‌ক যে মুল্‌ক সেও বহুক্ষণ হাস্যপরিহাস করে ক্লান্ত হয়ে ঘুমুই ঘুমুই করছে—এমন সময় ছোকরাটি ঘরে ঘরে হেঁকে বলে গেল, জেণ্টেলমেন—প্লিজ—; উই স্টার্ট ফ্রম হিয়ার জাস্ট আফটার অ্যান আওয়ার—জাস্ট আফটার অ্যান আওয়ার, অ্যাট টেন—কাবুল টাইম টু এণ্ড।

এরই মধ্যে আমেরিকান অধ্যাপকটি সব ঘরে নক্‌ করে জিজ্ঞাসা করে বেড়াচ্ছেন, জায়গা আছে? পেতে পারি? দর্শনের অধ্যাপক ভদ্রলোকটি খাঁটি দার্শনিক। মায়াবাদী কি-না জানি না, তবে সুখেও হাসি দুঃখেও হাসি; এবং সব সময়েই নিজের জন্যে যেটুকু করণীয় তা ভুলে যান। সকলকে যখন ঘর দেওয়া হচ্ছিল তখন তিনি নীচে কোথায় বসে ছিলেন। পরে একটা খালি ঘরে ঢুকেছিলেন—আমি এবং আনন্দই ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম; কিন্তু সে ঘর তার আগেই অন্যকে বিলি করা হয়েছিল, তিনি এসে দখল করায় অধ্যাপকটি বিনা আপত্তিতে বেরিয়ে এসে ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, একটু জায়গা হবে? কোথায় জায়গা—তরী কানায় কানায় ভরা। শেষে

তিনি ছুখানা কম্বল নিয়ে করিডোরে মেঝের উপরই শুয়ে পড়লেন। এদিকে ঘণ্টাখানেক পরে সেই আমেরিকার ক্যামেরাওয়ালা ভদ্রলোক আবার নক্ করে বলে গেলেন, জেণ্টেলমেন—প্লিজ এক্সকিউজ মি, ছুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, রাত্রে আর যাওয়া হল না। আমাদের প্লেন ছাড়বে ভোর চারটের সময়। আবার ভোর সাড়ে তিনটের সময় ঠিক ডাকছেন, উঠুন উঠুন। আমাদের যাবার সময় হল। উঠলাম। মুল্‌ক উঠেই বললে, ওয়াণ্ডারফুল বয়। ইজ'ণ্ট ইট, তারাশঙ্করবাবু?

রেস্তোরাঁয় ব্রেকফাস্ট সাজানো। সব খেতে বসে গেল। আমার বিপদ। মুখ-হাতে জল দিই নি, বুরুশ-মাজন সব ব্যাগে, এই ভোরবেলা (সাড়ে তিনটে হলেও বেশ ভোর হয়েছে। রাশিয়ায় এখন সূর্যোদয় হয় চারটে সাড়ে চারটেয়। সন্ধ্যা হয় দশটায়) খাব কী? রেস্তোরাঁয় মুখ-হাত ধোবার জায়গায় মুখে চোখে জল দিয়ে ইষ্টকে স্মরণ করে শুধু এক কাপ চা খেয়ে ইতি করলাম। মুল্‌ক অনুরোধ করলে খেতে, কিন্তু পারলাম না। মুল্‌ক সেই স্বর্ণকেশী সুইডিস ছুহিতাকে নিয়ে সেই সকালেই আসর জমালে।

মর্নিং, রাত্রে ঘুম হয়েছিল ভাল? গুড গুড ড্রীমস? নট অ্যাবাউট হেলথ্ সার্টিফিকেট?

ক্যামেরাওয়ালা ভদ্রলোক রাত্রি থেকেই ক্যামেরাটার জন্যে ব্যস্ত হয়েছেন। সেটা তিনি, মাত্র ছু ঘণ্টা পরে প্লেন ছাড়বে জেনে প্লেনেই রেখে এসেছেন। বার বার বলছেন—ওঃ, ক্যামেরাটা রেখে এসে যে কী ভুলই করেছি। ক্যামেরাটা যদি যায়—ওঃ। প্লেনে জিনিস গোলমাল হলে যে কোথাকার জল কোথায় পৌঁছয় কেউ বলতে পারে না। একবার আমার সুটকেস হারাল ইউরোপে। দশ দিন পর খবর এল সে সুটকেস জমা হয়েছে অস্ট্রেলিয়ায় সিডনীতে। কথাটা শুনে তখন কৌতুক বোধ করেছিলাম, প্লেনে উঠে সবাই চিন্তিত হলাম। প্লেন একেবারে ঝাড়ামোছা। জিনিস-

পত্রের চিহ্ন মাত্র নেই। চীনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানি—কম্যুনিস্ট রাজ্যে একটা সূচও কোথাও যাবে না। অন্য দেশের অভিজ্ঞতা আমার নেই। অন্য দেশেও হয় না শুনেছি। তবে গোলমাল হয় এ শুনেছি। যাবার কথা ভিয়েনা কি রোম কি প্যারিস, কিন্তু ভদ্রলোকের কথা অনুযায়ী, গিয়ে পড়ল নিউ ইয়র্ক কি হংকং কি টোকিও। ভদ্রলোক হন হন করে নেমে গেলেন। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই প্লেনের মাল রাখবার সেই গর্তের মধ্যে ঢুকে ক্যামেরাটি বের করে আনলেন।—নাউ ইট ইজ অলরাইট। ডোণ্ট ওরি—এভরিথিং ইজ দেয়ার।

প্লেন ছাড়ল চারটের সময়। সূর্য উঠেছে আকাশে, মেঘ নাই। প্রসন্ন দিঙ্মণ্ডল। যাত্রীদের মুখে চোখে ক্লান্তির ছাপ থাকলেও মনে কোন সংশয় শঙ্কা নেই। হাসিখুশী চলছে। দাড়ি কামানোর জন্য সকলেই ব্যস্ত। ইউরোপে মুখ না-ধুলেও চলে, কিন্তু দাড়ি কামানো না-হলে চলে না। সকলের পকেটেই চিরুনি। মুল্‌ক একজন আমেরিকানের সেফটি রেজার নিয়ে ক্ষৌরকর্ম সেরে নিলে। চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ে বসল। আমার ভাল লাগল না। মুখ ধোওয়া হয় নি। আমি তাকিয়ে দেখছিলাম, এখানা কালকের প্লেনখানা কি না? ঠিক ধরতে পারলাম না। শুনেছি রাশিয়ানরা প্লেন সম্পর্কে খুব সতর্ক; আবহাওয়া খারাপ হলে তার মধ্যে কখনও ঝক্কি নেয় না। ফলে রাশিয়ায় প্লেন দুর্ঘটনা সব থেকে কম। ভাবছিলাম কাল হয়ত দারুণতর দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। মেঘের সেই ঘনঘটা এবং স্ক্রুর মাথায় বরফ-জমার স্মৃতি মনের মধ্যে ভাসছিল। আজ আকাশে খানা-খানা সাদা হালকা মেঘ চারিদিকে ছড়িয়ে আছে; গতি নেই; যেন অলস বিশ্রামে সূর্যালোকের দিকে মুগ্ধনেত্রে তাকিয়ে শুয়ে রয়েছে। প্লেন তিরিশ হাজার ফুটের উপরে, নীচের ছড়িয়ে-থাকা বিচ্ছিন্ন মেঘের পুঞ্জের ফাঁকে ফাঁকে মাটির পৃথিবী দেখা যাচ্ছে—পাহাড়-

বন-নদী-বসতি-গ্রাম-শহর। নদীর জল এবং সবুজ শোভা সব থেকে স্পষ্ট। নিবিষ্ট মনে দেখছিলাম ; মধ্যে মধ্যে পৃথিবীবিখ্যাত রাশিয়ান ভূপৃষ্ঠ সংগঠনের আভাস পাচ্ছিলাম যেন। হঠাৎ প্লেনের গতি কমল। যাত্রীদের মধ্যে চাঞ্চল্য অনুভব করলাম। বাইরের দিকে তাকাচ্ছে। মস্কো এসেছে। হ্যাঁ, এসেছে—বিরাট শহরের মাথায় পাক খেতে খেতে প্লেন নামতে শুরু করল। মস্কো!

গোটা পৃথিবীর মানসদৃষ্টি এবং মন এই শহরটির দিকে আবদ্ধ। প্রশংসায় নিন্দায় মস্কোর নাম মুখরিত। কেউ বলে এখনও খুঁজলে মাটি খুঁড়লে রক্তের চিহ্ন পাওয়া যাবে। সে রক্তপাতের না-কি আজও বিরাম নেই। পথেঘাটে আতঙ্ক থমথম করছে। মানুষের স্বাধীনতা নেই। মানুষ বোবা। কেউ বলে—স্বপ্নের রাজ্যের মত সুন্দর। সাম্যের নববিধানে সুন্দর সুশৃঙ্খল, মানুষের তৃপ্তিতে প্রসন্ন, নবজীবনের অপূর্ব বিকাশে নন্দনকানন ; সমৃদ্ধিতে মস্কো সোনার। আমার মন জানে দুটোই সত্য নয়। তবে সত্য বলব—বাইরের পৃথিবীর নানান্ কথা শুনে এবং কম্যুনিস্ট-দলত্যাগী কিছু লেখকের লেখা পড়ে মস্কোর মানুষের জীবনে বহু বন্ধনের কঠোরতা সম্পর্কে কিছু বিরূপ ধারণা নিয়েই মস্কোর মাটিতে পা দিলাম। এরও চেয়ে ভয় ছিল কম্যুনিস্ট কর্মী সম্পর্কে ; কে জানে কত উগ্র হবেন! দুটি মহিলা এবং একটি তরুণ হাসিমুখে এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিলেন, হ্যালো মুল্‌ক!

মুল্‌ক বললে, ইনি ব্যানার্জী।

আমরা জানি। ব্যানার্জী তারাশঙ্কর। দিল্লিতে দেখা হয়েছিল। লীডার, ইণ্ডিয়ান ডেলিগেশন।

মেয়েটিকে আমিও চিনেছিলাম। ইনি ছিলেন এশিয়ান কনফারেন্সে রাশিয়ান দলের ইণ্টারপ্রিটর। মেয়েটির আশ্চর্য শক্তি, ইংরেজীতে অনুবাদ করে, মনে হয় যেন নিজে স্বাধীনভাবে বক্তৃতা করছে। এবং আশ্চর্য আবেগের সঙ্গে বলে, যাতে

মানুষের মনে ভাবের ছাপ পড়ে। শ্রীমতী আক্‌সানা কুগসকায়া, দ্বিতীয়া হলেন শ্রীমতী নাটাশা, হিন্দী-উর্দু জানেন, তিন বৎসর দিল্লিতে ছিলেন। তরুণটির বয়স নিতান্ত অল্প—রোমোনভ।

আক্‌সানা প্রাণবন্ত মেয়ে; বয়সে তরুণী নয়—চঞ্চলাও নয়, কিন্তু যেমন কর্মক্ষমা তেমনি বাক্‌পটীয়সী। সে মুল্‌ককে বললে, কিন্তু এ কী? তোমার হাতে ছড়ি?

মুল্‌ক বললে, বুড়ো হওয়া অভ্যাস করছি।

বুড়ো? তুমি? সর্বনাশ!

তবে মিঃ মেননকে অনুকরণ করে মেনন হবার চেষ্টায় আছি।

সাহিত্য ছেড়ে পলিটিকস্? মিথ্যে কথা।

তবে সত্যি বলি শোন। তোমরা এখান থেকে স্পুটনিক ছাড়ছ—আমি বম্বেতে ভারতীয় যোগবলে স্পুটনিকের মত আকাশে উঠতে গিয়ে যোগভ্রষ্ট হয়ে পড়ে গিয়েছি।

যাক্, এখন বাক্‌পটুতা বন্ধ করে এস। কাল রাত তিনটের সময় এরোড্রোম থেকে ফিরে গেছি। যতবার জিজ্ঞাসা করেছি ততবার বলেছে—দু ঘণ্টা পর।

আমি চারিদিক তাকিয়ে দেখছিলাম। দেখলাম যা—তাতে দুটোর কোনটাকেই সত্য বলে মনে হল না। মস্কো মাটির পৃথিবীর উপর বিংশ শতাব্দীর ইট-কাঠ-মাটিতেই গড়া। মানুষের জীবনোচ্ছ্বাসেও কোথাও স্তিমিত শঙ্কিত ভাব দেখছি না। রূঢ়তাও দেখছি না। কাস্টমস্ এ বিষয়ে কব্জির কাছে নাড়ীর স্পন্দনের মত। আমেরিকানরা সকলেই এখানে প্লেন ধরবার জন্য বেশ কয়েক ঘণ্টা—অর্থাৎ চব্বিশ ঘণ্টা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। তাঁদের জিনিসপত্র নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটিতে কড়াকড়ি বা রূঢ়তা দেখলাম না। তবে ঐ হেলথ্ সার্টিফিকেট নিয়ে আবার একদফা পরীক্ষার সূত্রপাত দেখলাম। শেষ পর্যন্ত দেখি নি, কারণ আমাদের কোন কিছু স্পর্শ করা দূরের কথা পাস্‌পোর্ট নিয়ে অতিথি শুনে

সসম্ভ্রমে আমাদের যাবার অনুমতি দেওয়া হল। পাসপোর্টে ছাপ ইত্যাদি লেখকসংঘ কর্তৃপক্ষ করাবেন সময়মত। গাড়ি বেরিয়ে এল এরোড্রোম থেকে।

মস্কো শহর এখান থেকে প্রায় একুশ-বাইশ মাইল। পিচঢালা প্রশস্ত আধুনিক যুগের পথ। অসাধারণ নয়। বাতাস বেশ ঠাণ্ডা। আমাদের দেশের অগ্রহায়ণ মাসের মত। এটাই মস্কোর গ্রীষ্ম। গাড়ি চলল—দু পাশে ঘন বন—গাছগুলি উঁচু খুব নয়, নতুন পাতায় ভরে আছে। মধ্যে মধ্যে পথের ধারে যাত্রীরা বাসের অপেক্ষা করছেন। একসময় সম্মুখে গীর্জার চূড়ার মত একটা সূচ্যগ্র চূড়া দেখা গেল। আক্সানা বা নাটাশা কেউ পিছন থেকে বললেন, ওই নতুন ইউনিভারসিটি। গাছপালায়, বাগানে, মনোরম রাস্তার মধ্যে মধ্যে স্ট্যাচুতে ভরা, ঝকঝকে তকতকে পরিবেশ। তারই মাঝখানে পঁচিশ-তিরিশ তলা বিশাল সৌধ, একদিকে সামনে মস্কো নদী—সমস্ত মিলে এমন একটা কিছু—যা সত্য বিস্ময়বিমুগ্ধ করে দিলে আমাকে। এক জায়গায় একটা কিছু গড়ে তোলা হচ্ছে। সেটা দেখিয়ে বললে, মেত্রোর এক্সতেনশন হচ্ছে। অর্থাৎ আণ্ডারগ্রাউণ্ড রেলওয়ের নতুন লাইন আসছে এবং এইখানে স্টেশন হচ্ছে। আমি ইউনিভারসিটির বাড়ির দিকেই তাকিয়েছিলাম। কাচের জানলায় ভিতরের আলোর ছটা বাজছে। ঘর-ঘর-ঘর—হাজারে হাজারে ঘর। কত ছাত্র পড়ে? আমি ভাবছি—ওঁরা বলেই যাচ্ছেন, এখানে শুধু বিজ্ঞানশিক্ষার ব্যবস্থা। আর্টস সেকশন ইউনিভারসিটির পুরনো বাড়িতে আছে। ওরিয়েণ্টাল স্টাডিজ সেকশনে কয়েকজন ভারতবর্ষের লোক আছেন। বাঙালী নিশ্চয় আছেন। সায়েন্স বিভাগেই ছাত্রসংখ্যা বেশী। শতকরা পঁচাত্তর জন ছাত্র সায়েন্স পড়ে।

আমি বললাম, আপনাদের সম্পর্কে সে সংবাদ শুধু পৃথিবীর

লোকের কাছেই সুবিদিত নয়—পৃথিবীর সীমা ছাড়িয়ে চলে গেছে।

কথাটা ঠিক ধরতে পারলেন না ওঁরা। মুল্‌ক হেসে বললে, পিপ্‌-পিপ্‌-পিপ্‌! তোমাদের স্পুটনিকের কথাটা বলছেন মিঃ ব্যানার্জী।

হ্যাঁ। তোমাদের তৃতীয় স্পুটনিক কে জানে, ঠিক মুহূর্তে মাথার উপর পিপ্‌-পিপ্‌ করছে কি না।

হাসতে লাগলেন ওঁরা। গাড়ি ছুটে চলেছে, মিটার দেখে ঠিক ধরা যায় না কত মাইল বেগে চলেছে। কারণ ওদের মাপ মাইল হিসেবে নয়—কিলোমিটার হিসেবে, মাইলোমিটারও সেই হিসেবে দাগে কাঁটা ঘুরছে। আমরা ইউনিভারসিটির সীমা পেরিয়ে পড়লাম নতুন এলাকায়। নতুন এলাকা গড়ে উঠছে—রাস্তাগুলি সুপ্রশস্ত এবং দু ভাগে ভাগ করা; একটা দিক যাওয়ার জন্য, একটা দিক আসবার জন্য, মাঝখানে সবুজ ঘাসে এবং সারি-সারি গাছে-ভরা লম্বা ফালি। দুই পাশেও এমনই গাছের সারি। গাছের উপর এদের আশ্চর্য ঝোঁক। চীনেও এমনই দেখেছি। রাস্তার দু পাশে এক গড়নের এক ঢঙের শুধু বাড়ি-বাড়ি-বাড়ি। সব নতুন। তৈরী হয়েছে। তৈরী হচ্ছে। ভিত খুঁড়ছে; শুনে দেখলাম উঁচুতে দশতলা। ওঁরা বলেন, এসব মস্কো শহরের বাইরের গ্রামাঞ্চল, এখন মস্কোর অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে। এসব বসবাসের বাড়ি। আমি দেখলাম ক্রেন। যেসব বাড়ি তৈরী হচ্ছে তার এপাশে ওপাশে চারটে করে ক্রেন উঠছে-নামছে—এপাশে ওপাশে যাওয়া-আসা করছে। তৈরী বাড়িগুলির ছাদের ওপাশেও এখানে ওখানে ক্রেনের সারি। বাড়ি বোধহয় হাজারে হাজারে তৈরী হচ্ছে। মস্কো শহরে মানুষের বসবাসের সমস্যা, শহরে মানুষের বসবাসের সমস্যা অন্যতম সর্বাপেক্ষা জটিল সমস্যা। বাড়ির আর অন্ত নেই। তবু শুনেছি এখনও ছ-সাত বছরের

আগে এ সমস্যার সমাধান সম্ভবপর হবে না। তবু মানুষেরা ধৈর্য হারায় নি।

এ সংগঠনের বৈশিষ্ট্য এখানেই। আমাদের মত অতি অল্পে গলা ফাটিয়ে চেঁচায় না। ওদের যে সাফল্যই হয়ে থাক —তার মূল সূত্রটি সেখানেই। তার কারণ কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রে বিরোধী মতবাদ বা দলের কোন অস্তিত্ব নেই। সে ভালই হোক আর মন্দই হোক। তবে অসন্তোষ বা অসন্তুষ্ট পক্ষ থাকেই। সেটা কয়েক বারই বিভিন্ন কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রে আত্মপ্রকাশ করে মানবচিত্তের চিরন্তন পৃথক সত্তা, পৃথক অনুভূতি এবং মানস স্বতন্ত্রতার প্রমাণকে অনিবার্যরূপে অভিব্যক্ত করেছে। স্টালিনবাদের প্রতিবাদের মধ্যে রাশিয়া নিজেই এক্ষেত্রে সব থেকে বড় প্রমাণ দিয়েছে। কিন্তু ডি-স্টালিনাইজেশনের মধ্যেও স্টালিন তাঁর ভয়ঙ্কর বীর্য ও অনন্যসাধারণ প্রতিভা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন যুদ্ধোত্তর রাশিয়ার বিস্ময়কর দ্রুত সংগঠনের মধ্যে। এই ভয়ঙ্কর বীর্যবান লোকটি না-থাকলে যে-মস্কো দেখছি এ মস্কো দেখতে পেতাম না। যাক ওসব কথা।

যে হোটেলে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা—সে হোটেলটি গত বছর বিশ্ব যুব-উৎসবের পূর্বে তৈরী হয়েছে। নাম ইউক্রেনিয়া হোটেল। তিরিশতলা আন্দাজ উঁচু। ওই ইউনিভারসিটি সৌধেরই প্যাটার্ন। মাঝখানের মূল বাড়ির চূড়া গির্জার চূড়ার মত আকাশকে যেন তীরের মত বিঁধেছে। আরও কতকগুলি বাড়িরই ছক এই রকম। সুপ্রসিদ্ধ রেডস্টার ঠিক এমনি চূড়ার মাথায় জ্বলে। এদিক দিয়ে মনে হল যে, প্রাচীনকালের ধর্মের আমলের স্বর্গলোকমুখীনতার বিশ্বাসকে খর্ব করে বস্তুতান্ত্রিক সংগঠনের আরও বহুগুণ উঁচু চূড়াগুলি একটা চ্যালেঞ্জ দিয়ে মাথা তুলেছে। হোটেলে যাওয়ার সোজা সংক্ষিপ্ত পথ ছেড়ে একটু ঘুরপথেই ক্রেমলিন প্রাসাদ, রেড স্কোয়ার, মহামানব লেনিনের

সমাধি, গর্কী স্ট্রীট দেখে হোটেলে এলাম। প্রথমেই এই বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ল যে, আশ্চর্য পরিচ্ছন্নতা চারিদিকে, রাস্তায় লোকজন যেন কম, লোকজনের পরিচ্ছদ খারাপ বা জীর্ণ নয়, রাস্তা বিপুল-পরিসর ; রাস্তার দু ধারেই ঘন গাছের সারি, গাছগুলি যুদ্ধোত্তর কালে পোঁতা। উঁচুতে এখনও বড় হয় নি খুব। শুনলাম খুব বড় হবেও না। নাম লাইম ট্রি। চমৎকার ফুল হয়। ইউক্রেনিয়া হোটেলে নামলাম। পাঁচতলায় আমার ঘর নির্দিষ্ট হল—৫১৩। মুল্‌কের ঘর ৫২৩। আমার ঘরের নম্বারটা নোটবইয়ে লিখে নিলাম—পেয়তি আদিন থ্রি। মুল্‌কের ৫২৩ হল পেঁয়াত দোয়া থ্রি। আমাদের সঙ্গে মিল রয়েছে।

পুরো ছাব্বিশ-সাতাশ ঘণ্টা পর স্নান করে বাঁচলাম। ইউ-ক্রেনিয়া হোটেলটি পরিচ্ছন্ন সুন্দর হোটেল, কিন্তু ঠিক প্রথম শ্রেণীর বা অপরূপ অপূর্ব বলবার মত নয়। তবে যা বন্দোবস্ত আছে তার থেকে বেশী সাধারণ মানুষের প্রয়োজন হয় না। চীনে যে সব হোটেলে থেকেছি, সেগুলির ব্যবস্থায় এর থেকে মহার্ঘতা আছে ; এ হোটেলটির আয়োজনে প্রয়োজনের সবই আছে কিন্তু ঝকমকানি কি আড়ম্বর নেই। ভাল লাগল সেটি। স্নান, ইষ্টস্মরণ সেরে মুল্‌কের ঘরে গেলাম, সেখান থেকে নীচে খাবার ঘরে গেলাম। শুনলাম যে, এখানে দইয়ের চলন খুব। প্রত্যেকেই নাকি সকালে এক গ্লাস দই খাবেই। স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। চীনেও দই ছিল। কিন্তু সেখানে দইটা নিত্য বা বার বার অর্থাৎ প্রতিবার খাবারের সঙ্গে পাওয়া যায় নি। খাওয়ার টেবিলেই চীনের প্রতিনিধি দু জনের সঙ্গে দেখা হল। চীনে এঁদের সঙ্গে অল্প আলাপ হয়েছিল।

খাওয়ার টেবিলে বসে সর্বপ্রথম রাশিয়ার খুঁতটাই চোখে

পড়ল। খেতে বসলে অন্তত দেড় ঘণ্টা। শুধু এক কাপ চা পেতেও পঁয়তাল্লিশ মিনিটের কম নয়। ডিনার খেতে দু ঘণ্টা। তেমন তেমন ডিনার—ঘণ্টা তিনেক। এর মধ্যে বেশ কয়েকবার তাগিদ দিতে হবে। রাশিয়ানরা পরিমাণে বেশ একটু বেশা খান। মাংসজাতীয় খাদ্যেরই আয়োজন বেশী, তার সঙ্গে সালাড রুটি। মাছও আছে—ক্যাভিয়ার ত প্রিয় খাদ্য—ইলিশ মাছের স্বাদ-গন্ধ স্মরণ করিয়ে দেয়। এর সঙ্গে মাখন চিজ যথেষ্ট। শশার উপর রুচি বেশী এবং শশা সকল ঘটেই আছে। জল মিনারেল ওয়াটার। সাদা জল খুব কম খায় লোকে। খাবার-দাবার এবং জিনিসপত্রের দাম নাকি খুব বেশী। গাম্বার সাহেবের দেওয়া হিসেবের মধ্যে দেখছি—একটা ডিমের দাম এক রুবল—আমাদের এক টাকা দু আনা।

বাঙালীদের মধ্যে আমার শ্রদ্ধাভাজন ৺কালীমোহন ঘোষ মহাশয়ের ছোট ছেলে, শ্রীমান শুভময় ঘোষ ওখানে আছেন, অনুবাদকের কাজ নিয়ে গিয়েছিলেন। এমন ভাল ছেলে আর হয় না, আমার নিজের ভাই বা ছেলে ওখানে থাকলে সে যা করেছে তার চেয়ে বেশী কিছু করতে পারত না। সে একদিন তার বাসায় নিমন্ত্রণ করেছিল, সেখানে ওখানকার কর্মী সব বাঙালীই ছিলেন। সেখানে আয়োজন ছিল খাঁটি বাংলাদেশীয়—ডাল-ভাত-মাছভাজা-কপির তরকারি-চাটনি-পায়েস। আলোচনাপ্রসঙ্গে সেখানে শুনেছি চালের দর ন রুবল; সের কি পাউণ্ড জিজ্ঞাসা করতে ভুলেছি। ন রুবল সের হলেই বা কম কী—১০৵০ সের। মাছ মাংস অপেক্ষাকৃত সস্তা, কাঁচা তরকারি মহার্ঘ। মুল্‌ক বলেছিলেন—এক বেলা খেতে বসলে ৩০০ রুবল অনায়াসে উজাড় করে দিয়ে চলে আসা যায়। সামান্য ব্যাপার। কিন্তু উপার্জনও সেই অনুপাতে বেশী। আমাদের এখানকার যাঁরা ওখানে অনুবাদের কাজ নিয়ে গিয়েছেন, তাঁরা

প্রত্যেকেই পাঁচ হাজার রুবল উপার্জন করেন—কেউ কেউ অনেক বেশী করেন। তবে হিসেবটা চৌবাচ্চার নলের হিসাব—যত ঢোকে তত বের হয়, শুকিয়ে খটখটও করে না, আবার জমেও না। কোন দিন বালতি পুরে রঙ গুলে হোলি খেলা বোধ হয় যায় না। তবে একটা কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, এদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী সে রকমের নয়। আমাদের দেশেও কম্যুনিজমের আদর্শ এবং দর্শনকে একমাত্র সত্য বলে মেনে না-নিয়েও সম্পদ বণ্টন এবং ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের দিক থেকে ওই আদর্শকে গ্রহণ করা হয়েছে; সম্পদের জলে বিলাসবাসনার রঙ গুলে হোলি-খেলার মাতামাতি এ যুগে, যতক্ষণ পর্যন্ত সকল জনের জীবনের প্রয়োজনীয় জল পর্যাপ্ত পরিমাণে না-জোটে অন্তত ততক্ষণ কেউ সমর্থন করেন না। তবে প্রশ্ন একটা জাগে। যে দেশে এত কৃষির উন্নতি, সে দেশে শাকসবজি-তরিতরকারি এত আক্রা হবে কেন? অর্থনীতির প্যাঁচ আমার দুর্বোধ্য; স্বীকারই করছি ঠিক বুঝি নে; সেটার দোহাই যাঁরা দেবেন তাঁদের কাছে আমি কোন তকরারই তুলব না।

থাক ওসব ভারী ওজনের কথা। আমি অল্প কয়েক দিনের অতিথি। মনে মনে স্থির করেই এসেছি, এখানকার কাজ শেষ হওয়ামাত্র ফিরব। ছোট মেয়েকে প্রায় অপারেশন-টেবিলে দেখে এসেছি—সে কথাটা মনের মধ্যে বিঁধছে। এবং এই মস্কো আসাটা অপর কোন স্বার্থ বা ব্যক্তিগত অভিপ্রায়পূরণ-দোষে দুষ্ট না-হয় সেদিক দিয়ে আমার মনকে সজাগ এবং সচেতন রেখেছি। এই ধরনের অঙ্ক ও তথ্য দিয়ে যে বিচার সে বিচার করবার সময়, বুদ্ধি এবং সুযোগ আমার নেই। বলতে গেলে সে রুচিও নেই। অরুচিই আছে। বাংলা দেশের এই ধরনের বিচার নিত্যই কাগজে দেখি, অ্যাসেম্বলি কাউন্সিলে শুনি। বাংলা দেশের সে তথ্যমূলক চিত্র ভয়াবহ। অথচ আমি উনিশ শো বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ সনের বাংলা দেশের মানুষ, গ্রাম-শহর-সমাজকে সহজ চোখে দেখে দেখতে

পাই—কত পরিবর্তন ঘটেছে। দুর্মূল্যতা নিশ্চয় সত্য, কিন্তু তার সঙ্গে আজকের মানুষের জীবন অবশ্যই স্বচ্ছন্দ উন্নত ও সহজ, একথাও সত্য। যুদ্ধের যে আমলে নোট হাওয়ায় উড়েছে সে আমলের দুর্ভোগ-দুর্দশা থেকে এ আমলের জীবন দুর্বহ—একথা গলার জোরে যিনি যতই বলুন, সত্য ত নয়। আমি আমার এই সহজ দৃষ্টির উপরেই সেই কারণে নির্ভর করি বেশী। মস্কোতেও সেই সহজ দৃষ্টিতে যা পড়বে, যা মনে হবে সেই ধারণাই নিয়ে যাব। আমি জানি, ভাল ধারণা নিয়ে গেলে একশ্রেণীর অঙ্কবিদেরা আঙ্কিক প্রমাণ তুলে আমাকে কটু বলবেন, মন্দ ধারণা নিয়ে গেলে অন্য একদল আঙ্কিকেরা ওই প্রমাণ প্রয়োগ করে কটু বলবেন। এমন কি, রাশিয়া থেকে ফিরে গিয়ে চুপ করে থাকলেও নিষ্কৃতি পাব না।

খাওয়া শেষ করে উঠে আমরা বেরোলাম লেখকসঙ্ঘের আপিসে যাব বলে। হোটেলের লাউঞ্জে লোকের ভিড় এখন কমে এসেছে। নটা থেকে দশটা পর্যন্ত লোকে গিজগিজ করে। সব বেরিয়ে পড়ছেন। বাসে ট্যাক্সিতে মোটরে—মস্কোর দ্রষ্টব্য দেখতে। দল বেঁধে ডেলিগেশন চলেছেন কনফারেন্সে। সব থেকে বেশী আগন্তুক এখন ইউনাইটেড আরব দেশের—ইজিপ্সিয়ান দল। প্রবল দাপটে এবং উৎসাহের সঙ্গে ঘুরছেন। এখানে, অর্থাৎ হোটেলের লাউঞ্জে রয়েছেন জনকয়েক তরুণ-তরুণী, যাঁরা ছবি আঁকেন। খবর নিচ্ছেন, কে কোথা থেকে এসেছেন এবং তাঁকে ধরছেন—তুমি বোস, তোমার ছবি আঁকব। সিঁড়ির বাইরে আছে একদল বাচ্চা—সাত-আট থেকে বারো-চোদ্দ বছর বয়স, তারা নানান্ ব্যাজ নিয়ে ঘুরছে: ব্যাজ নাও এবং তোমার দেশের কয়েন থাকলে দাও। সুন্দর স্পুটনিকের ব্যাজ আছে—এই দেখ। সন্ধান করে তাদের এক-আধ জন ঘর পর্যন্ত ধাওয়া করে।

হোটেলে পৌঁছবার পর থেকে নাটাশা নাম্নী মহিলাটি আমাদের দেখাশুনা করছিলেন। তিনি বাইরে বেরিয়ে গাড়ি ডাকলেন।

লেখকসঙ্ঘের গাড়ি এখানে হাজির আছে। বাইরে হোটেলের সামনে প্রাইভেট গাড়ি, ট্যাক্সি এবং বাস দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি। ট্যাক্সিগুলির দু পাশে দরজার গায়ে কাচের জানলার ঠিক নীচেই দাবার ছকের মত লম্বালম্বি কালো-সাদা ছকের বর্ডার দেওয়া থাকে। ট্যাক্সির ঐটেই চিহ্ন। মিটার বাইরে দেখা যায় না। গাড়ি তখন অনেক হয়েছে। তা বলে প্রাচুর্য যাকে বলে তা বোধ হয় হয় নি। অন্তত তাই মনে হয়েছে। তবে উৎপাদন বাড়ছে। তার প্রমাণ এখন অনেকজনই ব্যক্তিগত উপার্জন থেকে গাড়ি কিনতে পাচ্ছেন। কয়েকটা জায়গাতেই সারিবন্দী গ্যারেজ দেখেছি। একসঙ্গে পঞ্চাশ-ষাটটা প্রাইভেট গ্যারেজ। এগুলি চোখে পড়ে মূল শহরের বাইরে এখন যে সব শহরের নতুন পাড়া গড়ে উঠছে সেখানে। মূল শহরের মধ্যে চোখে পড়ে নি। বহুসংখ্যক দরখাস্ত দেওয়া আছে—প্রয়োজন ও দরখাস্তের তারিখের ক্রম অনুযায়ী গাড়ি দেওয়া হয়। ছোট গাড়িগুলি বেশ লাগল। বড় গাড়িগুলি আরামপ্রদই শুধু নয়, একখানা গাড়িতে সাত জনের বসবার জায়গা। একটু ঘেঁষাঘেঁষি করে বসলে জনদশেক যেতে পারে। বোঝাই করলে আরও দুজন তো বটেই। লেখকসঙ্ঘের অনেকগুলি গাড়ি আছে। লেখকদেরও অনেকের নিজের গাড়ি আছে শুনেছি। সব থেকে বেশী উপার্জন যাঁদের তাঁদের মধ্যে লেখকদের স্থান প্রথম সারিতে।

মস্কোতে রাস্তায় বের হলেই প্রতিবারই আমার মত কলকাতার বাসিন্দার চোখে পড়বে এর পরিচ্ছন্নতা এবং রাস্তার প্রশস্ততার সঙ্গে তার দুই ধারে সবুজ গাছের সারি। যেন সবুজ পাড় দিয়ে মোড়া। আর-একটা জিনিষ চোখে পড়বে। এত বড় শহরের বড়-বড় রাস্তায় গাড়ি চলছে অনেক, কিন্তু পথচারী মানুষের সংখ্যাল্পতা। শহরের পরিবহন-ব্যবস্থায় কয়েকটি জায়গাতে ট্রাম দেখেছি: কলকাতার ট্রামের তুলনায় অত্যন্ত নিষ্প্রভ। ট্রলি-বাস আছে বড়

রাস্তাগুলিতে। তার সংখ্যাও খুব বেশী মনে হয় নি। বাস-স্টপেও খুব বেশী লোকের ভিড় দেখি নি। বাসেও ঝুলোঝুলি নেই। গর্কী স্ট্রীট প্রধান রাস্তা। চওড়াতে ফুটে গজে কত তা জিজ্ঞাসা করি নি, কিন্তু চৌরাস্তার মোড়ে আমাদের রাঢ়ের ভাষায় 'যাউতি আউতি' রুদ্ধগতি মোটরের সারি গুনে দেখেছি—এক-এক পাশে আট-আট ষোল সারি মোটর বাস ট্রাক মিলিটারী লরি দাঁড়িয়ে আছে এবং তুই পাশের তুইমুখী মোটরের সারির মধ্যে আর খান তিন-চার মোটর যাবার মত একটা ফালি পড়ে আছে। এ ফুটপাথ থেকে ও ফুটপাথে যাবার আসবার পথে পথিকেরা দাঁড়িয়ে থাকে ওই ফালির মধ্যে। মুল্‌করাজ ইউরোপ-চষা ব্যক্তি; সে বললে, ওয়াইডেষ্ট রোড ইন ইয়োরোপ, এশিয়া অ্যাণ্ড আফ্রিকা।

ক্রেমলিনের পাশে রেড স্কোয়ার পার হয়ে মস্কোর প্রশস্ততম রাস্তা গর্কী স্ট্রীট ধরে ভোরোভাস্কায়া স্ট্রীটের উপর লেখকসঙ্ঘের আপিস। পথে গর্কী স্কোয়ারে গর্কীর বিরাট প্রতিমূর্তি। লেখক-সঙ্ঘের আপিস-বাড়িটির বাইরে থেকে কোন জাঁকজমক নেই। ফটকে ঢুকেই চোখে পড়ে টলস্টয়ের প্রতিমূর্তি। বাড়িটিও মহাত্মা টলস্টয়ের স্মৃতিবিজড়িত; এখানেই তিনি অনেক বই লিখেছেন। তাই বাড়িটিকে ভাঙা হয় নি। ভিতরে ঢুকে পুরনো রাশিয়ার খানিকটা আমেজ পেলাম। দোতলায় সরু লম্বা করিডোরের তু পাশে ঘর। প্রতি ঘরেই কর্মীরা কাজ করছেন, টাইপরাইটারের দ্রুত লয়ের শব্দ—মধ্যে মধ্যে টেলিফোনের সাড়া, এ ঘর থেকে ও ঘরে কর্মীদের যাওয়া-আসার মধ্যেই যে-কোন আগন্তুক তা অনুভব করেন। একেবারে ওদিকের শেষ প্রান্তে একখানা ঘরে আমাদের নিয়ে গেলেন মাদাম ফেতাশা, সেই ঘরেই এই আগামী এশিয়া-আফ্রিকা-লেখকসম্মেলনের আয়োজন-দপ্তর খোলা হয়েছে। ঘরের মধ্যে তিন জন কর্মী—মিঃ চুগোনভ

সহকারীদের মধ্যে প্রধান, প্রকৃতপক্ষে সব ব্যবস্থা হাতে কলমে করবার বা করাবার ভার তাঁর উপর। বেশ শক্ত এবং সক্ষম একটি তরুণ। দেহে মনে দুই দিকেই। চমৎকার ইংরেজী বলেন, মৃদু এবং স্বল্পভাষী, চালে-চলনে চমৎকার সম্ভ্রম আর তেমনি কর্মপারঙ্গম; এমন তরুণ জীবনে কখনও নীচে পড়ে থাকে না বা থাকবে না-বলেই আমার বিশ্বাস। তাঁর সহকারীদের মধ্যে একজন তরুণী, নাম মরিয়ম, অপরজন চুকোনভের চেয়েও বয়সে তরুণ—নাম ভ্লাদিমির। এঁরাও ইংরেজীতে পারঙ্গম। শিষ্টাচার-পর্ব সারা হওয়ার পর সম্মেলনের আসন্ন উদ্যোগসভা সম্পর্কে কথাবার্তা বললাম। শুনলাম, প্রতিনিধি আসছেন সংযুক্ত আরব দেশ থেকে দু জন, চীন থেকে দু জন, ভারত থেকে আমরা দু জন, জাপান থেকে একজন—আমাদের এশিয়া সম্মেলনে যিনি এসেছিলেন সেই লেখক ইয়োশি হোটা। উজবেকিস্তানের বিশিষ্ট লেখক মিঃ রাশিদভ, সারা-রাশিয়া-লেখকসঙ্ঘের সেক্রেটারি মিঃ সুরকভ ও এই সম্মেলনের ভারপ্রাপ্ত লেখক মিঃ চেকোভস্কি —এই তিন জন থাকবেন। ৩রা জুন থেকে এই সমিতির অধিবেশন শুরু হবে। শেষ বোধ করি ৪ঠা তারিখেই হয়ে যাবে।

আমি বললাম, গোড়াতেই আমার একটা নিজের কথা জানিয়ে রাখতে চাই। হয়তো মস্কোতে আজ পৌঁছে প্রথম দেখাতেই কথাটা একটু অশোভন হবে; কিন্তু না-বলে আমার উপায় নেই। এবং পরে বললে আপনাদের এবং আমার উভয় পক্ষেরই অসুবিধা হবে। আমার ফিরে যাওয়ার কথা। আমাদের কমিটি মিটিং শেষ হওয়ার পরই আমি ফিরতে চাই। ৪ তারিখ শেষ হবে প্রত্যাশা করে ৬।৭ তারিখ আমি ফিরব—এমন বন্দোবস্ত করলে আমি অত্যন্ত অনুগৃহীত হব।

মিঃ চুগোনভ একটু বিস্মিত হয়ে গেলেন, বললেন, সে কী?

অন্তত এক মাস থেকে আমাদের দেশ ঘুরে একবার দেখবেন না? অন্তত লেনিনগ্রাদ—

বাধা দিয়ে আমি বললাম, আমি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত মন নিয়ে এসেছি মিঃ চুগোনভ, আমার ছোট মেয়েকে আমি প্রায় অপারেশন-টেবিলের উপর রেখে এসেছি। এবং এইবার আমি এই মিটিংয়ের কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজ, এমন কি দেশ ঘুরে দেখতে চাই নে। অর্থাৎ আমার এই আসার অর্থ এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে যেন আর কোন ইঙ্গিত কেউ করতে না-পারে।

মুল্‌ক আমাকে 'ভদ্রলোকের এক কথা—ভদ্রলোক' বলে রসিকতা করে বললেন, ও নিয়ে ব্যানার্জিকে আর অনুরোধ না-করাই উচিত। ওঁর মেয়ের সম্পর্কে সেন্টিমেণ্ট সত্যই উপেক্ষা করা যায় না। সেই প্রসঙ্গে আপনাদের জানাই, ব্যানার্জি মুল্‌কের মত ভবঘুরে নয়—ঘোরতর সংসারী। ওঁর নাতিনাতনীর সংখ্যা এই নিয়ে এক ডজন হল।

সত্যি?

স্বীকার করলাম, সত্যি।

মুল্‌ক বললে, দেখ আমার শুধু একটি মেয়ে। নাতিনাতনীর স্বাদ জানতে অন্তত দশ-বারো বছর। তখন ষাট পার হয়ে সত্যিই বুড়ো হয়ে যাব।

আমি বললাম, ষাট পার হলে যদি ওই স্বাদের অধিকার জন্মায় মুল্‌ক, তবে আমি ট্রেসপাসার নই। আমি এবার ষাট পার হচ্ছি।

বল কী? না—না—তুমি বাড়িয়ে বলছ। তুমি আমার বয়সী। নাতিনাতনীর কথা চেপে গেলে তুমি অনায়াসে কারুর প্রেমে পড়তে পার, কেউ তোমাকে দোষ দেবে না।

আমি আমার বড় নাতনীর কথা তুলে বললাম, দেখ, পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে আমার জন্মদিনে আমার বড় নাতনী

জন্মেছে। আমি তাকে সাক্ষী মানতে পারি। সে এখন পনের বছরের কিশোরী। তার ছেলেবেলায় আমি ছড়া লিখে দিয়েছি—

‘তুমি যখন হবে পঞ্চদশী
আমি হব ষাট বছরের বুড়ো—
শক্ত দাঁতে কড়মড়িয়ে
তুমি খাবে মেঠাই
ফোকলা দাঁতে আমি তখন
চুষব শুধু ভুরো।’

অবশ্য ইংরেজীতে কোনরকমে গোঁজামিল দিয়ে বোঝালাম।

এর পর আর প্রতিবাদ নেই। মুল্‌ক বললে।

মিঃ চুগোনভ নাটাশাকেই বললেন, তোমার উপর ভার রইল। তুমি মীরাকে বলে সব করিয়ে নেবে। ৬।৭।৮এর মধ্যেই যেন ব্যবস্থা হয়। অবশ্য মিঃ চেকোভস্কিকেও বলবেন ওঁরা।

ওঁদের ঘর থেকে নীচে এসে কোণের একটা ঘরে গিয়ে বসলাম।

এসে বসলাম লেখকসঙ্ঘের সেক্রেটারি মিঃ অ্যালেক্সি সুরকভের আপিসে। মিঃ সুরকভ রাশিয়ার একজন খ্যাতনামা কবি। এই লেখকসঙ্ঘের সম্পাদক আছেন দীর্ঘ দিন।

একজন মহিলা আমাকে বসতে বললেন। এইখানে এল আবার আকসানা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই মুল্‌ক হাস্যপরিহাসে জমিয়ে তুললে। লক্ষ্য আকসানা এবং নাটাশা। নাটাশা মেয়েটি বাক্‌-পটু নয়, কিন্তু আকসানা কথায়বার্তায় যেমন পটু, তেমনি উপস্থিত-বুদ্ধি। অসাধারণ কর্মদক্ষতা, তেমনি প্রাণশক্তির প্রাচুর্য। মিনিট-দশেক পরেই এলেন মিঃ চেকোভস্কি। ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে

বয়স বলে মনে হল। এসেই হাত বাড়িয়ে বললেন, ব্যানার্জি, আমাদের দেশে আপনি এসেছেন—আমি খুব খুশী হয়েছি—সৌভাগ্য বলে মনে করছি। কিন্তু আপনার শরীর এখন কেমন? আমি বড় খারাপ দেখে এসেছিলাম।

আমি বিস্মিত হলাম। কী বলব ঠিক ভেবে উঠতে পারছিলাম না। মিঃ চেকোভস্কি বললেন, কলকাতায় অল ইণ্ডিয়া লেখক-সম্মেলনের সময় আপনি অসুস্থ ছিলেন, আমি আপনাকে দেখতে গিয়েছিলাম। মনে আছে আপনার?

পড়ে গেল মনে। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় একজন রাশিয়ান ভদ্রলোক শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে এবং শ্রীযুক্ত হীরেন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার বাড়ি এসেছিলেন। অনেকক্ষণ ছিলেন, কথাবার্তাও অনেক কিছু হয়েছিল। কিন্তু আমার সে সময়ের শারীরিক অবস্থা এমনই দুর্বল ছিল যে, সব কথা সঠিক স্মরণ করতে পারি না। বললাম, হ্যাঁ, মনে আছে বইকি!

মিঃ চেকোভস্কি বললেন—বোধ করি আমাকে বাদ দিয়ে অন্যদের বললেন, আমি সেখানে গিয়ে একজন খাঁটি বাঙালী সাহিত্যিক দেখতে চেয়েছিলাম। অবশ্য ব্যানার্জির নামও জানতাম—তাঁর সঙ্গেও আলাপ করবার ব্যগ্রতা ছিল। কিন্তু তিনি অসুস্থ শুনে দুঃখিত হয়েছিলাম। আসেন নি সম্মেলনে। কিন্তু খাঁটি বাঙালী সাহিত্যিক দেখতে চাই শুনে মিঃ মুখার্জি এবং মিঃ দে আমাকে ওঁর বাড়িতেই যাবার জন্য বলেছিলেন। উনি অসুস্থ শরীরে শুয়ে ছিলেন, উঠে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। এবং—এবার আমার দিকে ফিরে বললেন, আপনার কথাগুলি কিন্তু এখনও আমার মনে গেঁথে আছে মিঃ ব্যানার্জি। আমি কখনও ভুলব না। Wonderful words!

এমন কী বলেছিলাম মনে আজও করতে পারি নি। একটা কথা মনে আছে, সেটা মনে থাকার কারণ বোধ হয় ব্যক্তিগত

প্রসঙ্গ এবং স্বার্থসংস্পর্শ। বই অনুবাদের কথা তুলে বলেছিলেন, কিছু বইয়ের নাম বলুন যা আমরা অনুবাদ করতে পারি। আমি বিভূতিবাবু এবং মানিকবাবুর বইয়ের নাম করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, কিন্তু আপনার কোন্ কোন্ বই আমরা অনুবাদ করতে পারি? আমি বলেছিলাম, সে আমি বলবার অধিকারী নই, হীরেনবাবু বিষ্ণুবাবু বলবেন। এবং আরও আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেছিলাম, দেখুন অনুবাদের কথা ভেবে কখনও লিখি নি। আমি বাঙালীর জন্য বাংলা ভাষায় লিখেছি—বাঙালী যদি তাতে তৃপ্ত হয়ে থাকে, তাতেই আমার শ্রম সার্থক। এর পর পৃথিবীর মানুষের দরবারে তাকে হাজির করবার প্রয়োজনীয়তা যদি গুণিজনেরা অনুভব করেন সে তাঁরাই করবেন। এই ধরনের কথাই বলেছিলাম। এবং বোধ হয় বলেছিলাম, আর ত কোথা থেকে কী ও কত পাব তার কথা ভাবার সময় নেই। আমার, অন্তত ভারতবর্ষের জীবনদর্শন অনুসারে এখন সময় হয়েছে—যা পেয়েছি, যা জমেছে, যার ফলে আমার অহং গড়ে উঠেছে তার বোঝা নামিয়ে দেবার।

এই কথাটা সত্য সত্যই এই অল-ইণ্ডিয়া রাইটার্স কনফারেন্সের সময় রোগশয্যায় শুয়ে বার বার করে মনে হয়েছিল, বাড়ির সকলকে ত বলেইছিলাম, কয়েকজন বন্ধু ও আগন্তুককেও বলেছিলাম। তাই মনে হচ্ছে, হয়ত এ কথাটিও বলে থাকব মিঃ চেকোভস্কির সামনে!

মিঃ চেকোভস্কি লেখকসঙ্ঘের ফরেন লিটারেচার—বৈদেশিক সাহিত্যবিভাগের সম্পাদক; দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত এবং এই আসন্ন সম্মেলনের উদ্যোগসমিতিরও সম্পাদক। সব ভার এঁরই উপর। এই সময়েই এলেন সবলকায় এক প্রৌঢ়। মুখে চোখে বুদ্ধি এবং দৃঢ়তার ছাপ। ভরাট কণ্ঠস্বর। এসেই হাত তুলে হৃদ্য গাঢ়কণ্ঠে কিছু বললেন, যার মধ্যে মুল্‌কের নামটা

বুঝলাম। এবং পরক্ষণেই কণ্ঠস্বরে সৌজন্যের সুর ফুটিয়ে যা বললেন তার মধ্যে বুঝলাম—বানার্‌র্‌জী।

মুল্‌ক বলে উঠল, আ! হিয়ার ইজ মিঃ সুরকভ দি পোয়েট—হু ইজ নট রাইটিং এনি পোয়েট্রি নাও। ইজ ইট ফর এনিথিং মোর ইনটারেস্টিং? ডীপলি ইন লাভ উইথ এ ভেরি বিউটিফুল লেডি?

আকসানা এরই মধ্যে মিঃ সুরকভের কথাগুলি অনুবাদ করে দিলেন ইংরেজীতে।—আচ্ছা, অবশেষে প্রেমিকবন্ধু মুল্‌করাজ আনন্দ্ এসে তা হলে উপস্থিত হলেন! এবং আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, বাংলা দেশের বিখ্যাত লেখক মিঃ বানার্‌র্‌জী, আপনাকে স্বাগত জানাই।

মুল্‌ক বললেন, মিঃ ব্যানার্জি শুধু বাংলা দেশের লেখক হিসেবে এখানে আসেন নি। তিনি সমস্ত ভারতবর্ষের লেখকদের প্রতিনিধি। আমি নিজে স্বীকার করছি যে, তাঁর সেই প্রতিনিধিত্ব অকৃত্রিম এবং আমার দাবি থেকে অনেক খাঁটি।

'রিয়াল' শব্দটি ব্যবহার করলেন মুল্‌ক। মুল্‌কের এসব সৌজন্য অকৃত্রিম এবং আত্মবিশ্লেষণ করে নিজের মূল্যনির্ধারণে সে কুণ্ঠাবোধ করে না। আমাকে এই সব ভাল কথা বলেছে বলেই বলছি না, তার এই আত্মবিশ্লেষণ প্রতিদিন লক্ষ্য করেছি।

এর পরই আর একদফা রঙ্গরসের কাটাকাটি শুরু হল। উপলক্ষ্য মুলকের হাতের ছড়ি। রসিকতা থেকে কিছুক্ষণ পরেই এল কনফারেন্সের কথা। প্রশ্ন করলেন, ভারতবর্ষে এ সম্পর্কে কত দূর কী হয়েছে?

আমি বললাম, কী হবে? আমি ত মাত্র চার দিন আগে সংবাদ পেয়েছি। আসতে পেরেছি এটা আমারই কাছে বিস্ময়কর। চার দিনের নোটিশে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারব এটা কি আপনারাই ভেবেছিলেন?

মুল্‌ক বললেন, সে ভাবতে পারা রাশিয়ার পক্ষেই সম্ভব। এদের কারবার জেট এবং রকেটের। এঁদের 'এক্ষুনি ওঠ, উঠাও গাঁটরি' এ স্বভাবের পরিবর্তন হবে না। আমি অবশ্য আগেই খবর পেয়েছিলাম এবং তোমাকে আর একজন-দু জনকে জানাতে বার বার লিখেছিলাম। কিন্তু সেই শেষ মুহূর্তে লিখলেন। আমি নিজে লিখি নি, কারণ আমি তোমাদেরই সঙ্গে আসব। নিমন্ত্রণ এঁরা করবেন। একক আমি ঝক্কি নিতে সাহস করি নি। যাক, আমরা ফিরে গিয়ে সব করব। তুমি সঙ্গে থাকলে কেউ বামপন্থী চক্রান্ত অপবাদ দিতে পারবে না।

আমি বললাম, আশা করি এই লেখকসম্মেলন দিল্লির অধিবেশনের মতই বাম দক্ষিণ দুই পন্থার আকর্ষণ থেকেই মুক্ত থাকবে, ঊর্ধ্বে থাকবে ; পঞ্চশীল এ ক্ষেত্রে পলিসি নয়—প্রিন্সিপল হবে।

নিশ্চয়। আমি এবং আমার বন্ধুরা অকপটভাবে মিঃ বানার্‌র্‌জীর সমর্থক। শুধু—। একটু থেমে মিঃ চেকোভস্কি বললেন, হয়ত সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা রাজনীতি ঢোকাতে চাইবেন। ইসরাইলকে বাদ দিতে চাইবেন।

বাদ কাউকে দেওয়ার সমর্থন আমরা করি না। কারণ বাদ দিলে শত্রুতা আমরাই ঘোষণা করছি। যাকে শত্রু বলছি, দোষ তার নয়। আর বাদ দিলেই আমরা নিজেদের খণ্ডিত এবং ক্ষুদ্র করব। ব্যর্থতা সেখানে নিশ্চিত। সার্থকতা সাফল্য—ঐক্যের মধ্যে, অখণ্ডতার মধ্যে, পূর্ণতার মধ্যে।

মুল্‌ককে অনুরোধ করলাম, ইংরেজীর আড়ষ্টতার মধ্যে যা ঠিক প্রকাশ করতে পারি নি সেটুকুকে স্পষ্ট প্রকাশে বুঝিয়ে দেবার জন্য। মিঃ সুরকভ শুনে খুশী হয়ে গভীর আবেগের সঙ্গে সমর্থন করেই অনেক কথা বললেন।

ঢং ঢং করে দুটো বাজল। তবু আলোচনা চলছে। ক্ষিধে

পেয়েছে বলতে পারছি না। রাশিয়ার ব্রেকফাষ্ট দশটায়, লাঞ্চ দুটোর পর বটেই—চলে পাঁচটা পর্যন্ত, ক্ষেত্রবিশেষে তার পরেও। এরই মধ্যে উজবেগিস্তান এবং ওই অঞ্চলের রিপাবলিকের লেখকরা এসে উপস্থিত হলেন। আলাপের মধ্যে মজলিস জমে উঠল। বোতল-বোতল মিনারেল ওয়াটার পান এবং বাক্যালাপ। এরই মধ্যে মুল্‌ক তুললেন—মিঃ রোরিকের (জুনিয়র) কথা। বিখ্যাত রাশিয়ান শিল্পী মিঃ রোরিক রুশবিপ্লবের সময় ভারতবর্ষে গিয়ে হিমালয়ের পাদদেশে বাস করেছেন। তাঁর এক ছেলে শ্রীমতী দেবিকারানীর স্বামী। দ্বিতীয় জনও শিল্পী। সোভিয়েট সরকার সম্প্রতি তাঁদের দেশে ফেরবার অনুমতি দিয়েছেন। বৃদ্ধ রোরিক বিখ্যাত শিল্পীই শুধু নন, মুল্‌ক বলে—তিনি সাধকশ্রেণীর লোক; তিনি ফেরেন নি, হিমালয়ের প্রভাবের মধ্যে সমাহিত তিনি। শ্রীমতী দেবিকারানীর স্বামীও ফেরেন নি, তাঁর এখানে নাকি বিস্তৃত ব্যবসা। ফিরেছেন—নবীন শিল্পী রোরিক। বাপের ছবির প্রদর্শনী করেছেন, সে প্রদর্শনী নাকি আশ্চর্য জনপ্রিয় হয়েছে। বড়-বড় গুণীদের মুগ্ধবিস্ময় অর্জন করেছে।

আমি তুললাম রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীর কথা। প্রশ্ন করলাম, কী করবেন আপনারা? অন্তত এশিয়াভুক্ত সোভিয়েটের রিপাবলিক-গুলির নিশ্চয় কিছু করা উচিত।

মিঃ সুরকভ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। উচ্ছ্বাস হলে মিঃ সুরকভের মুখখানি রক্তোচ্ছ্বাসে ভরে ওঠে। দুই হাত মেলে ধরে কথা বলেন। মাইডিয়ার সার্—তারপরই রাশিয়ানে আরম্ভ করলেন—আকসানা অনুবাদ করলেন—রাশিয়া সেই মহান কবিকে অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করে। তিনি একজন মহৎ কবি; বিরাট ব্যক্তি; আমি তাঁকে তরুণ বয়সে দেখেছি; আজও চোখে ভাসছে সেই মহিমান্বিত রূপ, কানে বাজছে তাঁর কথা। আমরা তার আয়োজন সমারোহ করে করব।

আমি বললাম, আমার দুটি প্রস্তাব আছে। প্রথম প্রস্তাব কবিগুরুর কোন-একটি নৃত্যনাট্য নিয়ে রাশিয়ার ব্যালে নৃত্যে রূপান্তরিত করুন। কবির সুরকে ভিত্তি করে রাশিয়ার সুরকারেরা তার ওপর সুরসৌধ গড়ে তুলুন। অপরূপ হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

উৎসাহিত হয়ে উঠলেন সুরকভ, মুল্‌ক, চেকোভস্কি এবং অপর সকলেও। বললেন, নাম বলুন। কোন্‌ নৃত্যনাট্য? আমি বললাম, তাসের দেশ অথবা চণ্ডালিকা অথবা শ্যামা। এবং দ্বিতীয় প্রস্তাবে বললাম, আমাদের শতবার্ষিকী প্রদর্শনীর জন্য আপনারা এখান থেকে কবির স্মৃতিপূত যা আছে তার ছবি, টেপ রেকর্ডিং আমাদের পাঠাবেন।

নিশ্চয়ই।

ঢং ঢং করে তিনটে বাজল। এবার ওঁরা বললেন, হ্যাঁ, লাঞ্চের সময় হয়েছে বটে।

লাঞ্চ খেয়ে উঠতে সাড়ে পাঁচটা। বাইরে তখন সূর্য সবে মধ্যাহ্ন-আকাশ থেকে পশ্চিমে দু-চার পা হেঁটেছেন বা তাঁর রথের চাকা দু-চার পাক ঘুরেছে মাত্র। গ্রীষ্মকালে রাশিয়ার আকাশ হয় আয়তনে বৃহৎ বা এ সময় সূর্যের সপ্তাশ্ব মন্থর পদক্ষেপে চলে। সূর্য ওঠেন চারটের সময়, অস্ত যান রাত্রি দশটায়। সাড়ে-পাঁচটার পর—এখনও প্রায় পাঁচ ঘণ্টা দিন বাকী। লাঞ্চ খেতেও সময় লাগে অনেক, সে কথা পূর্বেই বলেছি। আমরা এক সঙ্গে বসলাম অনেক। মিঃ চেকোভস্কি, মিঃ চুগোনভ, মিঃ ভ্লাডিমির, চীনের বন্ধু মিঃ গে-বাও প্রভৃতি। মেয়েরাও আছেন। তাঁরাই সর্বাগ্রে স্থান গ্রহণ করলেন। উজবেকিস্তান-কাজাগিস্তানের লেখকরাও রয়েছেন। খাবার আসর কিছুক্ষণের মধ্যে পানীয়ের উত্তাপে এবং আবেগে সরগরম হয়ে উঠল। আমাদের সামনে

একটা বিরাট টেবিলে প্রকাণ্ড একটি দল খেতে বসে—খাওয়া শেষ করছেন। তাঁদের মধ্যে জন তিন-চার ভারতীয় রয়েছেন। শুনলাম ট্রেড ইউনিয়ন ডেলিগেশন। একজন বাঙালীও ছিলেন এ দলে।

লাঞ্চ খেতে বসে শুনলাম ট্রেড ইউনিয়ন ডেলিগেশনে একজন বাঙালীও আছেন। পরে আলাপ হয়েছিল। নাম সতীশচন্দ্র—বোধ হয় চ্যাটার্জি। পশ্চিম-প্রবাসী বাঙালী, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা। যে-কোন কারণেই হ'ক, ইনি যেন আমাকে এড়িয়েই চলতে চেয়েছিলেন। এই কারণে বলছি যে, বাঙালী হয়েও মুল্‌কের সঙ্গে অনেক বেশী আলাপ করেছেন; ব্যগ্রতা প্রকাশ করেছেন। কয়েকজন মহিলাও রয়েছেন এই দলে; তাঁরা রাশিয়ার দো-ভাষী নন বলেই মনে হল। দো-ভাষীদের চেনা যায়, কারণ তাঁরা তদ্বির-তদারক করেন—নিজেদের গৃহস্বামিনী চেহারায় নিজেদের চিনিয়ে দেন। টেবিল থেকে দু-চার বার উঠে একেবারে ভাণ্ডারে গিয়ে তাগিদ দিয়ে আসেন। ব্যস্তসমস্ত ভাব, এটা খাও ওটা খাও বলার ভঙ্গি এবং খেতে খেতেও অনুবাদ করছেন—এই সব দেখে ধরা যায়।

লাঞ্চেও আমি দধিভাণ্ড নিয়ে বসেছিলাম। কিন্তু শুধু দইয়ে তিন প্রহরের ক্ষিধে মরল না। দেখলাম, সকলেই রুটিতে মাখন দিয়ে তাতে ক্যাভিয়ার মাখিয়ে পরিতৃপ্তি করে খাচ্ছে। আমিও ক্যাভিয়ারের পাত্রটায় ছুরির প্রান্তভাগ ঢুকিয়ে দিলাম। লাগল বেশ। বেশের চেয়েও বেশী। চমৎকার মুখরোচক। মনেও পড়ল না যে, কলকাতায় মাননীয় সোভিয়েট নেতারা যখন এসেছিলেন, তখন স্টেট ডিনারে ক্যাভিয়ারের ব্যবস্থা ছিল এবং খেয়ে আমি অসুস্থ হয়েছিলাম। আমার জন্য মাছের ব্যবস্থা ছিল,

কিন্তু সে খুব ভাল লাগল না আমার। মসলা আমি খাই না। কিন্তু তবুও এই এমনি শুধু সিদ্ধ মৎস্যখণ্ড—সে প্রায় আধ-সের খানেক—গলাধঃকরণ করা সম্ভবপর হল না। অবশ্য অর্ধ-সের পরিমিত মৎস্যখণ্ড—সে যেমনি মুখরোচক হ'ক, খাওয়ার সাধ্যও নেই আমার।

হঠাৎ হা-হা হাসির শব্দে মুখ ফিরিয়ে একটু বিস্ময় অনুভব করলাম। বিস্ময় ঠিক বলব না। কারণ আছে। বলব যেন কোন এক বিচিত্র সত্য আবিষ্কারে মুগ্ধ হয়ে সেই যিনি হাসছিলেন তাঁর মুখের দিকেই তাকিয়ে রইলাম। হাসছিলেন চীনের প্রতিনিধি মিঃ গে-বাও। চীনে তাঁকে দেখেছিলাম, কিন্তু আলাপ হয় নি; তবুও এক বিচিত্র কারণে তাঁকে আমার মনে ছিল। সেই বিচিত্র কারণটিকেই এই হাসির মধ্যে স্পষ্টতর হয়ে ফুটে উঠতে দেখলাম। চীনে ইয়াং সিকিয়াং নদীর উপর প্রথম তৈরী ব্রিজটি যে দিন আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হয়, সে দিন মিঃ গে-বাওকে আমি ঘণ্টাদুয়েক বা তিনেকের জন্য দেখেছিলাম। আলাপ হয় নি, কথা বলি নি, কাছাকাছি দাঁড়িয়েছিলাম—বহু সহস্র লোকের ভিড়ের মধ্যে। দেখবামাত্র মনে হয়েছিল বন্ধুবর ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়কে। আশ্চর্য মিল! দেখবামাত্র মনে পড়ে। শুধু তাই নয়, মিঃ গে-বাওয়ের প্রসাধন-মার্জনা এবং পোশাক-পরিচ্ছদের সুরুচির সঙ্গেও ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়ের মিল দেখেছিলাম। ডাঃ নীহাররঞ্জনের সহজ তারুণ্যের স্বচ্ছন্দ ভঙ্গির সঙ্গেও সাদৃশ্য দেখেছিলাম মিঃ গে-বাওয়ের। আজ দেখলাম, তাঁর হাসির সঙ্গে গে-বাওয়ের হাসির ঘনিষ্ঠ মিল রয়েছে। শুধু এইটুকুই নয়, ডাঃ রায়ের চরিত্রমাধুর্যের কথা সকল পরিচিত জনেরই সুবিদিত, এই মিঃ গে-বাওয়ের মধ্যেও তার প্রকাশ দেখেছি। এ প্রসঙ্গ এইটুকু হলে উল্লেখ করতাম না। আরও আছে এবং এই যাত্রার মধ্যেই তার স্থান সংস্থান বলেই মস্কোতে

কয়েক দিনের স্মৃতিকথার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে গিয়েছে; সেই কারণেই উল্লেখ করছি। সে ঘটনাটি এই—মস্কো থেকে ফেরার পথে কাবুলে তিন ঘণ্টা থাকতে হয়েছিল। স্নান খাওয়ার জন্য সেই আরিয়ানা হোটেলেই গিয়েছিলাম। তুলে দিল সেই চার নম্বর ঘরে। এবার ঘরে ঢুকে দেখি, চারটি বিছানার মধ্যে দুটি বিছানায় অধিকারের চিহ্ন সুস্পষ্ট। এলোমেলো বিছানা, জিনিসপত্র ছড়ানো, সুটকেস-ব্যাগ-সিগারেটের বাক্স, খাওয়া-চায়ের বাসন ইত্যাদি। তৃতীয় খাট দখল করে চায়ের বরাত করে ভাবছি—চা কতক্ষণে পাব এবং তারই ফাঁকে মাঝে মাঝে বিরক্তি উঁকি মারছে, কারা কোন দেশের লোক কখন এসে ঘরে ঢুকে আমারই মত ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকাবে। হঠাৎ একজন ঘরে ঢুকলেন। পরনে লুঙ্গি, ঊর্ধ্বাঙ্গে হাওয়াই শার্ট, লম্বা মানুষ, মাথায় ধবধবে পাকা চুল—অথচ মুখখানা অনেক কাঁচা; ভুরু না কুঁচকেই দাঁড়ালেন। আমি চমকে উঠলাম। এ যে অবিকল অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়! অবিকল। এমন কি, কপালে সামনের দিক থেকে টাক পড়ার ভঙ্গিটিও এক। লম্বায় এক। রঙে লোকটি অল্প একটু ময়লা।

জিজ্ঞাসা করলাম, Indian?

হেসে তিনি বললেন, Ceylonese. সে হাসিটুকুও অর্ধেন্দুর মত।

শুধু তাই নয়, তাঁর সঙ্গে পাশাপাশি বসে দিল্লি পর্যন্ত এসেছি, কথা বলেছি, দেখেছি—কথা বলার ধরনে, হাসিতে, চলনে, ভঙ্গি-ভঙ্গিমায় অর্ধেন্দুর সঙ্গে তাঁর আশ্চর্য মিল। চরিত্রে পর্যন্ত। ভদ্রলোক Ceylone Foreign Affairs-এ কাজ করেন। অর্ধেন্দু অভিনেতা, ছবির ডিরেক্টার। অর্ধেন্দুর ধাত এবং প্রকৃতি ঢিলেঢালা, বেশী খোলা। ইনি একটু সংযত—ফরেন্ অ্যাফেয়ারসের খিলে-জড়ানো ধাতপ্রকৃতির তার অপেক্ষাকৃত টান করে বাঁধা। এই দুটো

আশ্চর্য মিল থেকে মনে হয়েছে, চেহারার মিল যেখানে যত ঘনিষ্ঠ, প্রকৃতির মিলও সেখানে তত নিকট। তা একজন উত্তর মেরুর হন এবং একজন দক্ষিণ মেরুর অধিবাসী হন না কেন। গড়েন যে কারিগর, তাঁর বোধ হয় কতকগুলো ছাঁচ আছে। এক-এক ছাঁচে আকৃতি-প্রকৃতি এক-এক রকম হয়। রঙের বেলায় অন্য রঙের প্রলেপ দিয়ে সাদৃশ্য ঢাকবার যত চেষ্টাই তার মধ্যে থাক।

যাক। কোথা থেকে কোথায় এসে গেলাম! মস্কোতে পৌঁছে প্রথম দিনের লাঞ্চ খাবার টেবিল থেকে ফেরার পথে কাবুল থেকে দিল্লির প্লেনের মধ্যে ছিটকে পড়েছি।

লাঞ্চ-টেবিল থেকে খাওয়া অর্ধ-সমাপ্ত রেখে মিঃ চেকোভস্কি উঠে গেলেন। জাপান থেকে লেখক মিঃ হোটা আসছেন, তাঁকে প্রত্যুদ্গমন করে আনতে গেলেন। তিনিই তুলে দিয়ে গেলেন সন্ধ্যার পরের কর্মসূচীর প্রসঙ্গ। বলে গেলেন, শুধু আজকেরই নয়, এখন কয়েক দিনের সন্ধ্যার কর্মসূচী ঠিক করে ফেলতে। আজ পুতুল নাট্যাভিনয় দেখবার প্রস্তাব জানিয়ে গেলেন মিঃ চেকোভস্কি। অবশ্যই সে আমাদের অনুমোদনসাপেক্ষ।

রাশিয়ার অভিনয়শিল্প বহুকাল থেকে পৃথিবীবিখ্যাত। রাশিয়ার সাহিত্য, উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প এককালের পুস্কিন টলস্টয় থেকে এ কালের গর্কী পর্যন্ত বিশ্বসাহিত্যের দরবারে প্রথম সারিতে সমুজ্জ্বল গৌরবে সমাসীন। মস্কো আর্ট থিয়েটারের খ্যাতি প্রথম যৌবনে সবিস্ময়ে শুনেছি, যত নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে পড়েছি। পুরাণ ও মহাকাব্যের যুগের পর নাট্যসাহিত্যে টলস্টয় শ্রেষ্ঠ পুরুষ। রাশিয়ার ছোটগল্প আমার গল্পের আদর্শ। বিপ্লবোত্তর যুগে রাশিয়ার শিল্পসাহিত্য সম্পর্কে যে প্রশ্ন পৃথিবীর শিল্পী-

সাহিত্যিকদের মনে উদিত হয়েছে, সে প্রশ্ন আমার মনেও রয়েছে। কিছুকাল আগে একটি সভায় বিপ্লবোত্তর রুশ-সাহিত্য-সম্পর্কে আলোচনা হয়েছিল, তাতে একজন রাশিয়ার বিশিষ্ট সমর্থক সাহিত্যিক বলেছিলেন—গত চল্লিশ বছরে রাশিয়া তার বিগত ঐতিহ্যগৌরবের মুখ রক্ষা করতে পারে, এমন কোন সাহিত্যগ্রন্থ প্রকাশ করতে পারে নি। আমি অবশ্য অনেকটা ঐ মতের হলেও দুখানি বইয়ের নাম করে বলেছিলাম—'অ্যাণ্ড কোয়ায়েট ফ্লোজ দি ডন' এবং 'ফল অব প্যারিস'—এ দুখানি আশ্চর্য শক্তিশালী গ্রন্থ। অন্যান্য সংস্কৃতিমূলক শিল্পের ক্ষেত্রে অনেক বিরূপ সমালোচনার মধ্যে মস্কো বলশই থিয়েটারের নাম এবং প্রশংসার স্বীকৃতি শুনেছি। এ কথা অধিকাংশ জনই বলেছেন যে, রাশিয়ার নাট্যমঞ্চে পর্দায় নাটকে প্রাণ নেই, ভাববস্তু অস্পষ্ট এবং দুর্বল, কিন্তু প্রয়োগশিল্পে অভিনয়নৈপুণ্যে রাশিয়ার উন্নতি অসাধারণ। কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রে সমাজ থেকে জীবনের ভাব ও ভাবনা পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা এবং প্রচেষ্টার কথা পৃথিবীর সকল দেশেই বহু-আলোচিত; এর কতটা সত্য, কতটা বিরোধী মানসের বর্ণাঢ্য কল্পনা, তার বিচার না-করেই চীন সর্বাধিনায়ক মাননীয় মাও-সে তুঙের Let hundred flowers blossom—এই উদার বাণীর ঘোষণার কথা স্মরণ করে এইটুকুই বলি যে—Only one flower will blossom এই নিয়ম বা নীতি প্রচলিত না-থাকলে Let hundred flowers blossom এই ঘোষণার প্রয়োজন হল কেন? এবং এই নিয়ে দুনিয়ার মার্ক্সবাদী দলের মধ্যে নানান্ আলোচনাই বা হয়েছে কেন? এই সব প্রশ্নের সঙ্গে মুখোমুখি উত্তর রয়েছে —কম্যুনিস্ট দেশগুলির রঙ্গমঞ্চে, পর্দায়। এবং আরও একটি প্রশ্নের উত্তর ওখানে পাওয়া যাবে ভেবে খুশী মনেই মস্কোর সান্ধ্য কর্মসূচী-গুলিকে গ্রহণ করেছিলাম। সে প্রশ্নটি হল—শিল্পের ভিতর বড়,

না বাহির বড় ? ভাবরূপ বড়, না আঙ্গিক বড় ? জীবন বড়, না স্টাইল বড় ?

প্রথম দিনই দেখতে গেলাম পুতুল নাট্যাভিনয়। আমাদের দেশে 'পুতুলনাচ' আছে—তার মধ্যে অভিনয়ও আছে। আসলে অভিনয়ই হয়, কিন্তু দড়ির টানে পুতুলেরা ঘোরে ফেরে হেলে দোলে বলে—তাকে নাচানো বলে। এবং সে অভিনয় নিতান্তই টুকিটাকির মত ব্যাপার। এ অভিনয় রীতিমত স্টেজে দস্তুরমত দৃশ্যপট-পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে খাঁটি নাটকের অভিনয়, অদৃশ্য অন্তরাল থেকে পৃথক পৃথক কণ্ঠস্বরে পৃথক পৃথক পুতুল-পাত্রপাত্রীর বক্তৃতা হয়ে যায়। পুরো দেড় ঘণ্টা ধরে অভিনয় হল। চমৎকার লাগল। সঙ্গে ইণ্টারপ্রেটার ছিলেন মিস্টার ভ্লাডিমির। বয়স ৩২।৩৩ বৎসর। পড়াশোনায় চিন্তায় ভাবনায় খাঁটি ইণ্টেলেকচুয়াল। এঁরই মধ্যে প্রথম আভাস পেলাম—রাশিয়ানদের মন ত আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধনের কঠোরতায় পঙ্গু নয়। ভ্লাডিমিরের সংযম—আশ্চর্য সংযম। প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি কথাও বলেন না। একটি নিরভিমান নিরাসক্তি আছে। অথচ মর্যাদাবোধের পরিচয় তাঁর প্রতি পদক্ষেপে ও তুচ্ছতম আচরণের মধ্যে সুপ্রসন্ন বিনয়ের সঙ্গে প্রকাশ পায়। থাক সে কথা। ভ্লাডিমির দ্রুত তর্জমা করে নাটক বুঝিয়ে চলেছিলেন। নাটকটির মধ্যে হাস্যরসের সংস্থানই বেশী। পরিণামে মিলনান্তক। কিন্তু কিছুক্ষণ পর নাটকের ভাববস্তুসম্পর্কে আগ্রহ রইল না, শুধু অপার কৌতুক এবং বিস্ময়ের সঙ্গে দেখে গেলাম—এমন এক অপূর্ব শিল্পবস্তু, যার সঙ্গে তুলনা করা চলে ম্যাজিকের, সার্কাসে ক্লাউনদের বিস্ময়কর খেলার ; নিপুণ খেলোয়াড়ের তলোয়ার খেলা বা সঙ্গীতের ক্ষেত্রে দ্রুততম লয়ে তবলালহরার সঙ্গেও এর তুলনা করা যায়। যার শেষে আনন্দের মধ্যে শুধু বিস্ময় আছে—কোন রসের আবেগের স্পর্শ বা আবেদন নেই। অভিনয়ের শেষে প্রত্যেক পুতুলটি নিয়ে আসল মানুষগুলি হাসিমুখে

বেরিয়ে এলেন। পুরুষদের নাচিয়েছেন পুরুষে—মেয়েদের নাচিয়েছেন মেয়েরা। যার যা কথাবার্তা, তাঁরাই বলেছেন। কৌশল এবং আঙ্গিককে অভিনন্দন জানিয়ে হাল্কা মন নিয়ে ফিরে এলাম।

পরের দিনটি সকাল থেকেই অসুস্থ বোধ করছিলাম। সারাটা দিন উপবাস করে ঘরেই ছিলাম। এই দিন দু রকম কর্মসূচী ছিল—এক ছিল মহাত্মা টলস্টয়ের শেষ জীবনের বাসভবন এবং সমাধিস্থল 'পলিয়ানা' দেখা—সে সারাদিন এবং রাত্রির প্রথম প্রহর কাটানোর ব্যাপার। আর যাঁরা গেলেন না, তাঁদের জন্য একটি নাট্যাভিনয়ের কর্মসূচী। মুল্‌ক পলিয়ানা আগে গিয়েছেন, এবারে গেলেন না, তিনি সন্ধ্যায় নাটক দেখতে গেলেন এবং পরের দিন সকালে বললেন, কাল সন্ধ্যাটা ব্যর্থ হয়েছে তারাশঙ্করবাবু, দুঃখ পেয়েছি, সাহিত্য এবং নাট্যাভিনয়ের এত বড় রাশিয়ান ট্রাডিশনের এমন ব্যর্থতা!

চুপ করেই ভাবছিলাম। মুল্‌ক বললেন, কিছু বল তারাশঙ্করবাবু।

বললাম, কী বলব, সেই কথাই ভাবছি।

অথচ এই জাত স্প ুটনিক তৈরী করেছে।

বললাম, জড় জগতের বৈজ্ঞানিক সত্য আর সাংস্কৃতিক সত্য দুটো পৃথক এবং বিপরীতধর্মী। একটা শুধু বুদ্ধি এবং নিখুঁত ভাগ-মাপের আঙ্গিক নিয়মের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু সাংস্কৃতিক শিল্প তা নয়। উৎকৃষ্ট প্রেস, কাগজ এবং বাঁধাইয়ের ব্যবস্থা থাকলেই ভাল বই বের হয় না—লেখককে লিখতে হয়। কম্যু-নিজমের মধ্যে উৎকৃষ্ট সাহিত্য হবে না, এমন আমি মনে করি না। তবে যত দিন কম্যুনিজম মানুষের জীবনে সহজ এবং স্বচ্ছন্দ গতির

সঙ্গে মিলে না যাবে, তত দিন হবে না। সেটা হতে সময় লাগবে। মানুষের ধর্মজীবনে এর নজীর পর্বতপ্রমাণ।

সেই দিন সন্ধ্যায় গেলাম মস্কো আর্ট থিয়েটারে। টলস্টয়ের 'আনা কারেনিনা' অভিনয় ছিল।

রাশিয়ায় ছোট-বড় রঙ্গমঞ্চ অনেক। একটি স্কোয়ারকে থিয়েটার স্কোয়ারই বলা যায়। বিরাট বলশই থিয়েটার সর্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যেমন গঠনসৌন্দর্য তেমনি আকারে বড়। পাশেই চিলড্রেনস থিয়েটার। শুধু ছেলেদের জন্য নাট্যাভিনয় হয়। বলশই থিয়েটারের ভিতরে আমার যাওয়া ঘটে নি। এখানে এখন বলশই থিয়েটারের অভিনয় ঠিক হচ্ছে না। বলশই থিয়েটার-দল এখন মস্কোর বাইরে। এই গ্রীষ্মকালটি মস্কোর থিয়েটার-সিজন নয়। এ সময় মস্কোর থিয়েটার-দলগুলি বাইরে মফঃস্বলে চলে যায়; বিখ্যাত ব্যালে-দল চলে গিয়েছে দেশান্তরে। দেশান্তরের দল মস্কোতে এসেছে। ফরাসী ব্যালে-দলের নৃত্য চলছে। মস্কো ব্যালে শুনলাম প্যারিসে। থিয়েটার সিনেমাগুলি একেবারে ভর্তি থাকে। থিয়েটার-পাগল জাত। না-হয়ে উপায় কী? অন্নকরী কর্ম যতক্ষণ পর্যন্ত না আনন্দময় হয়ে ওঠে বা আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হয়, হৃদয়ের কামনা বাসনা বা তৃষ্ণা-মেটানো কর্ম না-হয় ততক্ষণ তাকে কর্মের অবসরে এমনি করেই পাগলের মত আনন্দের পিছনে ছুটতে হবে। চিরকাল ছুটেছে। ত্যাগের কালে ধর্মের যুগে স্বর্গের পরমানন্দের সন্ধানে কত কৃচ্ছ্রসাধনই না করেছে! কেউ ভগবানকে কল্পনায় মানসলোকে পেয়ে সেই আনন্দের মধ্যে সমাধিতে মগ্ন থেকেছেন; ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন আজীবন জনহীন অরণ্য পর্বতে কাটিয়ে দিয়েছেন; কত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের আনন্দে দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি বিশ্বজগৎ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে একা চিন্তামগ্ন থাকেন; সব আনন্দই কিন্তু দেহজ আনন্দের বাইরে;

সুতরাং আজ জীবনের বাইরের আয়োজনে যখন বিরাট কর্মযজ্ঞে মানুষকে উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হচ্ছে, তখন তার মনের আনন্দের জন্য সে ছুটবে বইকি। ভাবতে ভাবতেই যাচ্ছিলাম।

মস্কো আর্ট থিয়েটারে গিয়ে অভিনয়শেষে ভাবরসে উদ্বেলিত অন্তর নিয়ে ফিরে এলাম। রূপে এবং রসে ওতপ্রোত হয়ে মিশে আত্মপ্রকাশ যে করল, সে অপরূপ। কী অভিনয়! কী জীবনাবেগ! অথচ কী সংযম! আনা কারেনিনা, ভেরোনস্কি, আনার স্বামী—এই ত্রয়ী বেদনার আবেগে যেন ভেসে যাচ্ছিল, ডুবে যাচ্ছিল; বুকফাটানো চিৎকার করে, চোখের জলে ভেসে অভিনয় করে গেল। আমাদের দেশের আধুনিক সমালোচকেরা নিশ্চয় তাকে 'লাউড' বলবেন। বলুন, তবুও বলব, ওই বুক-ফাটানো চিৎকার করে চোখের জলে ভাসতে না-পারলে ওই অপরূপের সাক্ষাৎ মিলত না। বিচিত্র কৌশলে এই আবেগময় জীবনপ্রকাশকে পারিপার্শ্বিক বাস্তবতার আবেগবর্জিত কাঠিন্যের পটভূমির উপর স্থাপিত করে সত্যকার পৃথিবীকে অহরহ চোখের সামনে ধরে রেখে দিলেন। অতীতের নাটক বর্তমানের আশ্চর্য শিল্পকুশলতায়—রাশিয়ার বর্তমান রূপটিকে আশ্চর্যরূপে দেখিয়ে দিলে। যত কাঁদল আনা কারেনিনা, তত কাঁদল দর্শক। অভিনয়-শেষে মহিলাটি যখন পাদপ্রদীপের সামনে দাঁড়ালেন, তখনও তিনি আবেগে অভিভূত, দাঁড়াতে পারছেন না।

পরের দিন দেখলাম, একখানি বিপ্লবোত্তর নাটক। যে অংশটুকু রঙ্গমঞ্চের দেবার, তা অতি সুন্দর। দৃশ্যপট ও সজ্জা সময়ে সময়ে চোখে ধাঁধা ধরিয়ে দেয়; অভিনয় নিখুঁত। কিন্তু নাটকটি ব্যর্থ রচনা। আমি ঘুমিয়ে গেলাম। মুল্ক বার বার বললে, এই তোমাদের বর্তমান রাশিয়ান নাটক? ছি-ছি-ছি! মুল্‌করাজ ওদের পুরনো বন্ধু; ঘনিষ্ঠ পরিচয়; কিন্তু সমালোচনা সে কঠোরভাবেই করল। আরও অনেকবার করেছে। সব থেকে

ভাল লেগেছে যে, এই কঠোর সমালোচনাও তারা হাসিমুখে সহ্য করে। এ সময়েই শুনলাম, কিছু ভাল নাটক, যার মধ্যে জীবনাবেগ আছে, যার অভিনয় সার্থক হয়েছিল, স্টালিনের আমলের কঠোর নীতি অনুযায়ী সে নাটকগুলি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। যেমন হয়েছিল দস্তয়েভস্কির রচনাসম্ভার। দস্তয়েভস্কির রচনা আবার সসম্মানে প্রকাশিত হয়েছে। এবং এই নাটকগুলির উপর থেকেও নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছে। দস্তয়েভস্কির 'ইডিয়ট' সম্প্রতি চিত্রে রূপায়িত হয়েছে এবং মস্কোতে দেখানো হচ্ছে। আগ্রহ করে দেখতে গেলাম।

'ইডিয়ট' বড় বই; তাকে দু ভাগে ভাগ করে ছবি করেছেন। এক-এক ভাগ দেখাতে সময় লাগে দেড় ঘণ্টা। সব ছবিই ওখানে দেড় ঘণ্টার মধ্যে শেষ হয়। এইভাবে 'অ্যাণ্ড কোয়ায়েট ফ্লোজ দি ডন' তিন অংশে ভাগ করে তিনখানি ছবিতে সম্পূর্ণ হয়েছে। প্রতি ভাগটি নিয়ে প্রত্যেক ছবিটি কিন্তু স্বয়ং-সম্পূর্ণ। দ্বিতীয় অংশের সম্ভাবনা ও সুযোগ রেখেও এমন সুকৌশলে ছেদ টানা হয়েছে যে, অসম্পূর্ণতাবোধের অতৃপ্তি অনুভব করা যায় না। ছবিখানি গেভা-কলারের মত ওই ধরনের রঙিন। কিন্তু দুটো রঙ খুব গাঢ় হয়ে ফোটে। একটা লাল অপরটা মখমলের মত নরম কালো। ছবির অভিনয়ের ঢঙের মধ্যেও আনা কারেনিনার ওই জীবনাবেগ দেখতে পেলাম এবং গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত দেড় ঘণ্টার মধ্যে একটি এমন মুহূর্ত নেই, যেখানে সুর নরম হয়ে গেল মনে হয়। শুধু একটি কথা মনে হয়েছে, মনে হয়েছে কাল-পরিবর্তনের ইঙ্গিতটা যেন ঠিক স্পষ্ট নয়। দৃশ্যাবলীর অধিকাংশই স্টুডিয়োর বাইরে তোলা, চোখ জুড়িয়ে যায়। রৌদ্রালোকে, মেঘাচ্ছন্নতায়, রাত্রির অন্ধকারে, রাস্তার আলোয়, বরফ-ঢাকা রাস্তায়, বরফ পড়ার বাস্তব দৃশ্যে একেবারে সুখে-দুঃখে দ্বন্দ্বমান জীবন এবং এই বিচিত্র

বাস্তব পৃথিবী জড়িয়ে—রিয়ালিজম যাকে বলে, তাকে পরিস্ফুট করে তুলেছে। সেদিন আবার পরিপূর্ণ মন নিয়ে ফিরলাম।

এর পর দেখলাম, এবার যে ছবিখানি কানের ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছে। ইংরেজীতে নাম—'ক্রেনস ফ্লাইট'। ওই দেড় ঘণ্টার ছবি। ওই তীব্র গতি। ওই জীবনাবেগ। গত যুদ্ধকালে একটি বেদনার্ত নারীর হৃদয়খানিকে খুলে ধরা হয়েছে। গল্পটি এক কথায়—কাল যুদ্ধ তার জীবনকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে গেল। তবু তার হৃদয়বেদনাকে উত্তীর্ণ হয়ে সে একটি বৃহত্তর জীবনে পৌঁছল। করুণায়, শ্রদ্ধায় মন ভরিয়ে দেয়। দুটি ঘটনা মূল ঘটনা। যে দিন মেয়েটির প্রিয়তম যুদ্ধে যায়, সে দিন সে ছুটে গেল ফুলের গুচ্ছ নিয়ে তাকে বিদায়-অভিনন্দন জানাতে। কিন্তু দেরি হয়ে গিয়েছিল। ফুলের গোছাটি দেওয়া হল না, বিষণ্ণ মন নিয়ে ফিরে এল। শেষের দৃশ্যে যুদ্ধ জয় করে বিজয়ী সৈন্যেরা ফিরছে, হাজারে হাজারে মেয়েরা ছেলেরা বৃদ্ধেরা গিয়েছে ফুলের গোছা নিয়ে, আপন-আপন প্রিয়জনকে ফুল দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরছে। এর মধ্যে এই মেয়েটিও গিয়েছে ফুলের গোছা নিয়ে; সে জানে তার প্রিয়তম নেই, সে ফিরবে না; তবু সে গিয়েছে। হাতে ফুলের গোছা। ম্লান মুখে একটি অপরূপ হাসি ফুটিয়ে সকল বিজয়ী সৈনিককেই একটি করে ফুলের ডাঁটি বিলি করে চলেছে—সম্মুখ পানে।

সব মিলিয়ে এইটুকুই মনে হয়েছে, রাশিয়ার জাতীয় জীবনের সঙ্গে তার সাংস্কৃতিক জীবন একটা অস্বাভাবিক কঠোরতর গণ্ডী পার হয়ে মুক্ত গণ্ডীতে প্রবেশ করে সহজ ছন্দে নূতন করে সার্থক হবার স্বপ্ন দেখছে।

মস্কোতে ছিলাম আমি মাত্র ন দিন। তার মধ্যে ৩রা তারিখ থেকে ৫ই তারিখ (জুন) পর্যন্ত কাজে কেটেছে এশিয়া-আফ্রিকা লেখক সম্মেলনের উদ্যোগসমিতির অধিবেশনের মধ্যে। তিন দিন,

দু বেলাই অধিবেশন চলেছে। শেষের দিন এক বেলা। তার উপর অধিবেশনের মধ্যে দু দিন সন্ধ্যায় ছিল সামাজিক সান্ধ্য ভোজন অর্থাৎ অফিসিয়াল ডিনার। ডিনার শেষ হতে সন্ধ্যার পরও বেশ খানিকটা রাত্রি হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ সাড়ে দশটারও বেশী। এর পর আমি আর বের হই নি। একদিন অসুস্থ হয়ে ঘরেই নিজেকে বন্ধ রেখেছিলাম। এই দিনটির কর্মসূচী ছিল—মহাত্মা টলস্টয়ের সমাধি দেখতে যাওয়া। মস্কো থেকে যেতে আসতে প্রায় একশ মাইল বলে যেতে সাহস করি নি, কিন্তু আক্ষেপ রয়ে গিয়েছে। ইচ্ছা ছিল মহাত্মা টলস্টয়ের সমাধিতে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে আসব। যাই হ'ক, আমার অবস্থিতিকাল ন দিনের পাঁচটি দিনমান কেটেছে—একদিন অসুখে, চার দিন উদ্যোগসমিতির অধিবেশনে, বাকী ছিল চারটি দিনমান—এর একদিনের কথা বিস্তারিতভাবেই বলেছি অর্থাৎ প্রথম দিনের কথা, বাকী তিন দিনের একদিন ক্রেমলিন, একদিন মেট্রো অর্থাৎ মস্কোর বিখ্যাত টিউব রেলওয়ে এবং একদিন মস্কোর বিরাট স্থায়ী প্রদর্শনী দেখেছি। এবং ফাঁকে ফাঁকে ঘুরে বেড়িয়েছি। মস্কোর দিনমান গ্রীষ্মকালে তের-চোদ্দ ঘণ্টা, সুতরাং সময় কম পাই নি। কম পাই নি বলে একথা বলছিনে যে, এর মধ্যে গোটা মস্কো শহর দেখেছি, তার সমস্যা বুঝেছি এবং ঠিক বাহির ও ভিতরের স্বরূপটি নির্ণয় করে পাঠকদের কাছে ধরে দিতে পারব। রাশিয়া বর্তমান জগতে সমস্ত পৃথিবীর লক্ষ্যস্থল। রাশিয়া নিয়ে কাহিনীপ্রকাশের বিরাম নেই, সংখ্যা নেই। যাবার আগে হাওয়ার্ড ফস্টের বই পড়ে গিয়েছি, কয়েকজন বাঙালী বন্ধুর রাশিয়া-সম্পর্কে অপরূপ কাহিনীর কিছু কিছু পড়েছি। তুলনা করলে বলতেই হবে একজনের চোখে কালো চশমা, অন্য জনদের চোখে একরঙা নয়—সাতরঙা চশমা। অথচ মিঃ হাওয়ার্ড ফস্টের ধারণার কথা পুরো মিথ্যে বলতে পারব না, তার কারণ তিনি

স্ট্যালিন-আমল-সম্পর্কে যে-সব কথা লিখেছেন তা এ কালে রাশিয়ান কর্তৃপক্ষের দ্বারাই স্বীকৃত। তাঁরাই এই পৃথিবীতে এ কথা প্রকাশ করেছেন, তার পূর্বে এ সত্য সম্পূর্ণরূপে পৃথিবীর কাছে অজ্ঞাত ছিল। আমাদের মত যাঁরা কয়েক দিনের বা এক মাস দু মাসের জন্য যাই তাঁরা আতিথ্যে সমাদরে প্রশংসায় পরিতৃপ্ত এবং স্ফীত হয়ে ফিরে এসে রাশিয়ার জীবনকে সুখের জীবন বলে বর্ণনা করি—তখন সত্যের যিনি দেবতা, তাঁর চোখের কোণে হয়ত দুটি বিন্দু অশ্রু এসে জমা হয়। শুধু তাই নয়, আরও গুরুতর কথা আছে এর মধ্যে। সেটা হল এই যে, যখন আমরা এবং সমগ্র পৃথিবী এক কালান্তরের পথের ক্রান্তিসীমায় উপনীত, তখন তাদের সামনে আলোর বদলে আলেয়ার আলো জ্বেলে দেওয়া হয় কি-না—সেটা বিচার তাঁরাই করবেন। কারণ মস্কোতে এ সম্পর্কে যখনই কথা হয়েছে, যখনই মস্কো শহরের সৌন্দর্য, পরিচ্ছন্নতাসম্পর্কে এবং যেটুকু জীবনশৃঙ্খলা বাইরে থেকে দেখা যায় তার সম্পর্কে প্রশংসা করেছি—তখনই উত্তর পেয়েছি, উত্তরদাতার চোখে-মুখে বিষণ্ণতা ফুটে উঠেছে, কথা বলবার আগেই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছেন, তার পর বলেছেন—You don't know Mr. Banerjee what price we paid for it.

তাই যা চোখে দেখেছি তা সত্য হলেও, যা বুঝেছি বলে মনে করেছি এবং বলছি তার সম্পর্কে আমি নিজেই নিশ্চিত নই। এবং এই কারণেই দেখার সময় এবং বুঝবার সময় যথাসাধ্য নিজেকে সংযত করেছিলাম। আমাদের দেশসম্পর্কে কোন প্রশংসা আমি বা আমরা করি নি, করেছেন তাঁরাই; ভারতবর্ষের নবসংগঠন কয়েক জন চোখে দেখে গিয়েছেন, বাকীরা শুনেছেন; তাঁদের সে প্রশংসা উচ্ছ্বসিত; কপট বা মৌখিক বলে মনে হয় নি। কারণ সেই সঙ্গেই কেউ কেউ প্রশ্ন করেছেন, কিন্তু তোমাদের দেশের অনেকে এতেও ঠিক খুশী নয় কেন বল ত? Rome was not built in a day;

আমাদের মস্কোর এত প্রশংসা করছ, কিন্তু মস্কোর সমস্যা এখনও বিপুল। এত বাড়ি তৈরী হচ্ছে দেখে তুমি বিস্ময় প্রকাশ করলে, কিন্তু মিঃ বানার্জি, সত্য বলতে এখনও এই বাড়ি-সমস্যার সমাধান করতেই আমাদের আরও অন্তত সাত বছর লাগবে।

আমাদের সর্বজনের প্রীতিমাধুর্যমণ্ডিত শ্রীজওহরলাল নেহরু ওদের কাছে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আত্মা। Greatest Soul কথাটি উচ্চারণ করেছেন। Man কথা বলেন নি। ভারতবর্ষের মানুষ এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা ও বর্তমান সামাজিক অবস্থাসম্পর্কে কোন ব্যক্তিই কোন দিন কোন বিরূপ সমালোচনা বা মন্তব্য করেন নি। বরং আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি অন্য দেশ থেকে যাঁরা কম্যুনিস্ট দেশে যান তাঁদের মধ্যে কিছু লোক কম্যুনিষ্ট দেশসম্পর্কে ওঁদের দেশের লোকদের আসামীর মত জেরা করেন। সমালোচনা এবং জেরার মধ্যে তফাত আছে, সেই কথাটা পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। ঘটনাটি ঘটেছিল চীনের পথে। চীনের পথে আমি ছিলাম একক যাত্রী, আমার সঙ্গী কেউ ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই নিঃসঙ্গ বোধ করছিলাম। প্রথম সত্তর-পঁচাত্তর মাইল সীমান্ত থেকে ক্যাণ্টন পর্যন্ত কোন ইণ্টারপ্রেটারও ছিলেন না। একদল পাকিস্তানী যাচ্ছিলেন কোন এক ডেলিগেশনভুক্ত হয়ে। এঁরা সবাই ইংরেজীনবিস। পাকিস্তানের পূর্বাংশে যে বিশাল জনসাধারণ আছেন, যাঁরা দেশী পোশাক পরেন, দেশী ভাষা বলেন, দেশী চালে হাঁটেন এঁরা তাঁদের কেউ নন, কোন সম্পর্ক নেই তাঁদের সঙ্গে এঁদের, এ কথা আমি হলফ করে বলতে পারি। কারণ সারা পথটা এঁরা নিজেদের মধ্যে কথা বলেছেন ইংরেজী ভাষায়। কদাচিত ইংরেজী-জানা চীনা ইণ্টারপ্রেটার তরুণটির কাছে মনের কথা গোপনের অভিপ্রায়ে দু-চারটে কথা উর্দুতে বলেছেন। সেলিম নামধারী একজন ঢাকাই পাকিস্তানী ছিলেন তাঁর সঙ্গে আমি বাংলায় কথা

বললে তিনি ইংরেজীতে উত্তর দিয়েছেন। এঁরা ক্যাণ্টন পর্যন্ত সারাপথটা যেভাবে এই চীনা তরুণটিকে জেরা করেছিলেন তার উদ্ধত অভদ্র ভঙ্গি এবং বিষয়বস্তু দেখে ও শুনে আমার মনটা ছি-ছি করে উঠেছিল। কিন্তু আশ্চর্য, এই তরুণ যে ভদ্রতা, বিনয় এবং মিষ্টতার সঙ্গে তার সম্ভ্রমপূর্ণ জবাব দিয়েছিলেন, তাতে আমার মন ওই ছেলেটির সম্পর্কে সম্ভ্রমে ভরে উঠেছিল। শুধু তাঁর প্রতিই নয়, এদের শিক্ষার প্রতিও। আমার যতদূর বিশ্বাস এবং যা শুনেছি পড়েছি, তাতে এই অভদ্রতা ও ঔদ্ধত্য ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে নেই, থাকতে পারে না। এটা সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্ত্যের কম্যুনিজম-বিদ্বেষ—ইংরাজী শিক্ষাদীক্ষা ও ওদের আনুগত্যের সঙ্গে এদের মনে সঞ্চারিত হয়েছে। ভারতবর্ষের যাঁরা চীন রাশিয়া যান, তাঁদের কিছু লোক এর ঠিক বিপরীত আচরণ করে থাকেন। অর্থাৎ ওদেশের প্রশংসার গুরুত্ব বাড়াতে আমাদের দেশের নিন্দা করেন। করেন ঠিক ওই ওঁরা যে জোরের সঙ্গে আতিথ্যের সুযোগে কটু কথা বলেন সেই জোরের সঙ্গে। তার কথাও কিছু কিছু ওখানে শুনেছি। ওঁরা এই নিন্দাগুলি কীভাবে অর্থাৎ আনন্দের সঙ্গে বা অস্বস্তির সঙ্গে গ্রহণ করেন ঠিক বলতে পারব না, তবে এইটুকু বলব, রাশিয়ানদের মধ্যে যাঁরা কম্যুনিষ্ট তাঁরাও এ কথা আমার বা আমাদের কাছে বলবার সময় বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। এবং আর-একটি জিনিস দেখেছি। ভারতবর্ষের যাঁরা কর্মোপলক্ষ্যে ও দেশে রয়েছেন, ওঁদের দেশের চাকরিতে রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আমার পরিচিত গোঁড়া রাশিয়াভক্ত ব্যক্তিও ও দেশে গিয়ে এই মহাসত্য অনুভব করেছেন যে, তাঁরা রাশিয়ার কেউ নন, অন্তত রাশিয়া-ভূমিতে তাঁদের জন্য মাতৃস্নেহ সঞ্চিত নেই; যে স্নেহ আছে, সে স্নেহ আতিথ্যের স্নেহ। এঁরাও আজ ভারতবর্ষের প্রগতি স্বীকার করেন। এবং ও দেশ সম্পর্কে এমন দু-চারটে কথাও বলেন যা নিন্দাপর্যায়ভুক্ত।

যাই হোক, আমি আত্মপ্রশংসাও করি নি, আত্মনিন্দাও করি নি। আমাদের দেশের বহিরঙ্গের উন্নতির কথা ওঁরাই বলেছেন। মুল্‌ক ভারতবর্ষের গঠনকার্য নিয়ে কিছু রচনাও ওদেশে দিয়েছেন। আমি একমাত্র ভারতবর্ষের এই বিশেষ মনটির কথা বলছি, ভারতবর্ষের যে মনটি কোন দেশকেই শত্রু মনে করে না। এবং এও বলেছি যে, শত্রু মনে না-করা মনোভাব নেতিবাচক ; এখানেই ভারতবর্ষের মন সংসারবিচ্ছিন্ন সন্ন্যাসীর মনের মত সমাধিস্থ নয়—তার ইতিবাচক—অস্তিবাচক উপলব্ধিতে সুপ্রতিষ্ঠিত ; সে-সব দেশকেই মিত্র ভাবে, শুধু ভাবা নয়—মিত্রতার আবেগ অনুভব করে। এইজন্যই পঞ্চশীল দিতে পারে সে।

কথাটা তাঁরা শ্রদ্ধা এবং বিস্ময়ের সঙ্গে শুনেছেন।

এর পরেও বলেছি, আমাদের দেশে সমাজে ত্রুটি আছে বিচ্যুতি আছে, সে ত্রুটি এবং বিচ্যুতি আমাদের দেশধর্মের নয়, সমাজ-ধর্মের নয়, পুরনো দেশধর্ম এবং সমাজধর্মকে আমরা নূতন করে পরিবর্তন করে নিয়েছি, একালের পক্ষে তা নিঃসংশয়ে উপযোগী ও কল্যাণকর, কিন্তু ব্যক্তিজীবনে তা আমরা এখনও সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে পারি নি। ত্রুটিবিচ্যুতি আমাদের ব্যক্তিগত। আমরা তা জানি। তার জন্য আমাদের বেদনা আছে, কিন্তু যেটুকু আছে তার জন্য আমরা আনন্দ অনুভব করি। আমরা এই শান্তিতে আছি যে, আমরা কারুর শত্রু নই।

আমরা তা বিশ্বাস করি। এখন আমরা তা বুঝতে পারছি। এই উত্তর শুনেছি। ওদের দেশের সাধারণ লোকেরও এ বিশ্বাস অকৃত্রিম।

একদিন পথে একটি কৌতুককর ঘটনা ঘটেছিল, ভারতবর্ষ-সম্পর্কে রাশিয়ানদের এই মনোভাব এই ঘটনাটির হাস্যকর কৌতুকময়তার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল। আমরা, অর্থাৎ আমি

এবং মুল্‌ক, সে দিন সোভিয়েট লেখকসংঘের সেক্রেটারি মিঃ সুরকভের নিমন্ত্রণে লাঞ্চ খেতে গিয়েছি প্রাগা রেস্টুরেন্টে। সঙ্গে আছেন মাদাম আকসানা ক্রুগস্‌কায়া। গিয়েছিলাম ত্বটোর সময়, রাশিয়ান ঐতিহ্যের সম্মান রেখে নামলাম সাড়ে চারটেয়, আড়াই ঘণ্টার পর। তাও আকসানা বললেন, একটু তাড়াতাড়ি চল, মুল্‌কের ও বানার্জির এনগেজমেণ্ট আছে লিটারারি গেজেটের অফিসে। বানার্জিকে পেমেণ্ট নিতে হবে তাঁর প্রবন্ধের জন্য। নইলে সে দিন আসর খুব জমে উঠেছিল হোটেলের ঢিমে চালের জন্য নয়—সে দিন আমাদের চার জনকে খাবার দিচ্ছিল তিন জন ওয়েটার, জমে উঠেছিল প্রাগা রেস্টুরেন্টের উপাদেয় খাদ্যের জন্য। আমরা নিরামিষ দেশের লোক, আমাদের সুক্তোর স্বাদ অবিস্মরণীয়। কিন্তু সে দিন প্রাগা রেস্টুরেন্টে যে ভেজিটেবল স্যুপ খেয়েছি, তা আমার মত ভোজনরস-বেরসিক লোকেরও অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। এবং তার সঙ্গে গল্প ও সুরকভ এবং মুল্‌কের বাক্‌যুদ্ধ। যাই হোক, আড়াই ঘণ্টা পরে নেমে দেখি, আমাদের গাড়িখানি যথা স্থানে নেই। শ্রীমতী আকসানা আমাদের হোটেলের সামনে রেখে গাড়ি খুঁজতে গেলেন। আমরা দাঁড়িয়ে আছি ভারতীয় রঙ এবং আকার-প্রকারের মহিমায় প্রকট হয়ে, শ্বেতাঙ্গ রাশিয়ানেরা একটু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে যাচ্ছে; যাচ্ছে বেশ সম্ভ্রম রেখে পাশ কাটিয়ে। দৃষ্টিতে কারও তীক্ষ্ণতা নেই, ভ্রূতে কুঞ্চন নেই; ভালই লাগছিল। ইতিমধ্যে হঠাৎ এক প্রৌঢ় থমকে দাঁড়াল। একটু টলমলো ভাব। বোধ করি লাঞ্চে ভদ্‌কার পরিমাণ একটু বেশী হয়েছিল। দাঁড়িয়েই মুখের দিকে তাকিয়ে রাশিয়ানে কী প্রশ্ন করলেন। তার মধ্যে বুঝলাম একটি শব্দ—ইণ্ডি ?

আকসানা ফিরে এসেছেন তখন। তিনিই উত্তর দিলেন—তার মধ্যেও শব্দটি আবার উচ্চারিত হল, ইণ্ডি। সুরের তফাতটাও বুঝলাম। একটা প্রশ্ন, অপরটা উত্তর।

বাস, লোকটি দুই হাত তুলে উচ্চকণ্ঠে কিছু বললে, তার মধ্যে দুটি শব্দ বুঝলাম— ইণ্ডি এবং নেহরু। সে একবার নয়, বারকয়েকই। এবং তারপরই দুই হাত বাড়িয়ে আমাদের দুজনের গলা জড়িয়ে ধরে আমার গালে কয়েকটা চুম্বন এবং মুল্‌কের গালে কয়েকটা চুম্বন। উদ্ধার পাই একজন ট্যাক্সিওলার বুদ্ধিবলে। আকসানা নিবারণ করবার চেষ্টা করেছিল; কিন্তু সে তা শুনবে কেন? তার পাকস্থলী থেকে মাথা পর্যন্ত ভদ্‌কা তখন উথল-পাথাল। সে ওই এককথাই বার বার উচ্চারণ করে এবং কুক্ষিগত আমাদের দু জনকে পরমসমাদরে চুম্বন করে। ওই ট্যাক্সিওলাই তাকে কিছু বলে বারেকের জন্য আমাদের দু জনকে তার হাত ছাড়িয়ে গাড়ির দরজা খুলে বললে, উঠে পড়।

শুনলাম লোকটি বলছিল—নেহরু মহৎ আত্মা; ভারতীয়রা অপূর্ব মানুষ; আমাদের শ্রেষ্ঠ বন্ধু। ভদ্‌কা খেয়ে ওই লোকটি উচ্ছ্বাসভরে যা বলেছিল, তাই সব রাশিয়ানই অন্তরে অন্তরে পোষণ করে একথা বললে বোধ হয় ভুল হবে না। এবং যুদ্ধ ও হত্যা সম্পর্কে ওদের মন সত্যই বিমুখ। একটু কথাবার্তার মধ্যেই একথা উচ্ছ্বাসের সঙ্গে অথবা হৃদয়াবেগের সঙ্গে ওদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে। ইউরোপের অন্য দেশের মানুষ বিশেষ দেখি নি। দেখেছি ইংরেজদের। তাদের দেখে এবং ইউরোপের কিছু-কিছু বই পড়ে মনে হয়েছে, হৃদয়াবেগের বা উচ্ছ্বাসের দিক দিয়ে তারা খুব সংযত ও সংহত। রাগেও চেঁচায় না, দুঃখেও ভাঙে না, প্রেমেও বিগলিত হয় না। ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা মাপা-মাপা কথায় হিসেব করে কথা বলে। কঠিন শত্রুতার পণ নিয়ে মজলিস থেকে ওঠবার সময় হাত ঝাঁকি দিয়ে হাসিমুখে বলে যায়—Wish you good luck বা এই ধরনের কোন শুভেচ্ছাবাণী, যা তার অন্তরের একেবারে বিপরীতধর্মী। রাশিয়ার চতুর বুদ্ধিজীবী রাজনীতিজ্ঞদের সঙ্গে মিশিওনি, তাঁদের কথা জানিও না; তবে বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিক থেকে সাধারণ মানুষ

পর্যন্ত এরকম নয়। আবেগ এবং উচ্ছ্বাস তাদের বের হবেই। রাগেও হবে, ভালবাসার মধ্যেও হবে। এদিক থেকে রাশিয়ান-চরিত্রে পূর্ব এবং পশ্চিম দুই দিকেরই প্রভাব রয়েছে।

ক্রেমলিন দেখতে গিয়ে কথাটা বেশী করে মনে হয়েছিল। ক্রেমলিন প্রাসাদ প্রথম তৈরী হয় প্রায় আট শ বছর আগে। সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তার মধ্যে প্রাচীনতম গির্জার মিনারেট এবং সোনালী গম্বুজগুলি আজ ঝকঝক করছে এবং সমরখন্দ তাসখন্দ প্রভৃতি অঞ্চলের প্রভাবের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। ভিতরের ছবিগুলির মধ্যেও মনে হয়েছে মধ্য-এশিয়ার ছাপ রয়েছে। এই ক্রেমলিনকে কেন্দ্র করেই মস্কো নগরীর প্রতিষ্ঠা। মস্কোর পুরনো কালের গঠন এইজন্যই গোলাকার। মস্কো নদীতটের উপরেই এই ক্রেমলিন প্রাসাদকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে বড়-বড় রাস্তাগুলি বৃত্তাকারে বেষ্টন করে রয়েছে। আট শ বছর আগের রাশিয়ানদের উপর ইউরোপ থেকে এশিয়ার প্রভাব বেশী। অন্তত মধ্য-এশিয়ার। উরাল পর্বতমালা এবং উরাল নদীর দু পাশে যে সকল উচ্ছ্বাসময় জীবনাবেগ একদা এদিকে মধ্যপ্রাচ্য, ভারতবর্ষ মঙ্গোলিয়া, ওদিকে ইউরোপে, বিশেষ করে নিম্নাংশে, ঝড় তুলেছিল, যে আবেগ সে দিন পর্যন্ত কাজাকিস্তান কশাকদের জীবনকে রোমাঞ্চকর কাহিনীর বিষয়বস্তু করে তুলেছিল, যার কাহিনী রুশ সাহিত্যে সুপ্রচুর, বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার সাহিত্যের মহাকাব্যধর্মী অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'অ্যাণ্ড কোয়ায়েট ফ্লোজ দি ডন'-এ যে জীবনাবেগ রন রন করে, সেই আবেগ অল্পবিস্তর রাশিয়ার সর্বত্রই ছিল। সেকালে এশিয়ার প্রভাবই প্রবলতর ছিল। পিটার দি গ্রেট সেন্টপিটার্সবার্গে রাজধানী স্থাপন করে ইউরোপের প্রভাবকে নিয়ে এসে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন পশ্চিম রাশিয়ায়। শুনেছি ক্ষেত্রবিশেষে অনেক আইনও তিনি করেছিলেন। তখন থেকেই রাশিয়া ইউরোপমুখী। এবং অকর্ষিত

ভূমির মত হৃদয়ক্ষেত্রে ইউরোপের ফসল আশ্চর্য উৎপাদনে সার্থক হয়েছে। সাহিত্যে নাটকে সঙ্গীতে নৃত্যে সে কোন দেশ থেকে পশ্চাদপদ থাকে নি। পৃথিবীর উপন্যাস-সাহিত্যে টলস্টয় একক। দস্তয়ভস্কি, তুর্গেনিভ, চেকভ প্রভৃতি স্রষ্টারা সুদুর্লভ। ব্যালের ক্ষেত্রে ত কথাই নেই; ফ্রান্সে যার জন্ম, তা সব দেশই নিয়েছে, কিন্তু রাশিয়া সকল দেশের সঙ্গে ফ্রান্সকেও পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছে। এর মধ্যেও সেই আবেগের পরিচয় এবং স্পর্শ আছে। আজ বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় মানুষের সকল নূতন শিক্ষাদীক্ষা এবং সংগঠনের মধ্যেও সেই স্পর্শ পাওয়া যায়। সবল দেহ, প্রচুর আহারগ্রহণের শক্তি, কর্মে জেদ, খোলা প্রাণ, আবেগ—এদের বৈশিষ্ট্য। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিবার, গৃহ, প্রেমের স্থান কতটা তা সঠিক আমি বলতে পারব না, কিন্তু এর তৃষ্ণা এদের ধাতুগত। সেই কারণেই এরা যুদ্ধ চায় না, অকৃত্রিম কামনায় শান্তি চায়। কিন্তু যুদ্ধ লাগলে এরা উন্মাদ হতে পারে। স্টালিনগ্রাদের যুদ্ধ শুধু কম্যুনিজমের যোগানো শক্তিতে সম্ভবপর হয়েছে বলে আমি মনে করি না, এর পিছনে রাশিয়ানদের ধাতুগত শক্তি ও উন্মাদনা ছিল বলেই আমি বিশ্বাস করি।

ক্রেমলিনের প্রাসাদের একটি অংশে জার-শাসিত রাশিয়ার মিউজিয়ম আছে। সেখানে পুরাতনতম আমলের জারদের ব্যবহৃত গাড়ি এমন কি সাজসজ্জা পরানো খড় বা ওই ধরনের বস্তু দিয়ে ঠাসা ও ঘোড়ার চামড়া দিয়ে তৈরী ঘোড়া, মণি-রত্ন-মুক্তা-খচিত পোশাক, মুকুট, ক্রস, ছোরা, তরোয়াল, পিস্তল, বন্দুক, সিংহাসন, বর্ম এবং নানা বিলাসোপকরণ, থরে থরে পরের পর সাজানো রয়েছে। তার পাশে পাশেই সাজানো আছে ধর্মগুরুদের পোশাক-পরিচ্ছদ, সেগুলিও মুক্তা এবং মণি-রত্ন-খচিত। সে কী রাশি-রাশি সম্পদ! এর মধ্যে হৃদয়হীন শোষণ ও ব্যক্তিস্বার্থের পরিচয় যেমন স্পষ্ট, তেমনি স্পষ্ট এদেশের মানুষদের সরল বিশ্বাস এবং

নির্ভরশীল আনুগত্যের পরিচয়। নানেরা পোপেদের জন্য অর্ধেক জীবন পরিশ্রম করে মুক্তাখচিত পোশাক তৈরী করেছে। কশাকেরা সুদীর্ঘ ভল্ল এবং বিপুল ওজনের বন্দুক নিয়ে লড়েছে। প্রাণ দিয়ে জারকে রক্ষা করেছে। বিনিময়ে পেয়েছে শুধু অবজ্ঞা অবহেলা আঘাত। সেটাকে তারা সেকালের যুগধর্মে অদৃষ্ট বলেই মেনে নিত। কিন্তু যেদিন বিপ্লব এল, সেদিন আর রক্ষা থাকল না। যে রক্তপাত ও যে রুদ্রতাণ্ডব হল, তা নানান্ দেশের বিপ্লব-তাণ্ডব থেকে স্বতন্ত্র ; সে ভীষণতম। আমার পড়া অবশ্য সামান্যই, তারই মধ্যে মনে পড়েছিল—জার-পরিবারের শেষ রজনীর কথা। এরা যখন ক্ষেপে ওঠে তখন সে ক্ষ্যাপামি এই ধাতুগত হৃদয়াবেগের জন্য ভীষণতম হয়ে ওঠে। তবে এদের ক্ষেপতে দেরি লাগে। অন্যথায় এ বিপ্লব রাশিয়ায় অনেক আগেই হওয়া উচিত ছিল। অন্তত ইউরোপের বিশ্ববিখ্যাত দুটি প্রজা-অভ্যুদয়ের পর ১৯১৮ পর্যন্ত এই সবল জাতির চুপ করে থাকার কথা নয়। দুটি এম্ব্যাসিতে গিয়েছিলাম। ভারতীয় এম্ব্যাসি এবং আফগান এম্ব্যাসি। দুটি বাড়িই সে আমলের কোন প্রিন্স বা কাউণ্টের অথবা কোন বিপুল ধনশালী ব্যবসায়ীর। বাড়িগুলির সে-আমলের গঠন-ঐশ্বর্য দেখে অভিভূত হয়েছি এবং এই কথাই ভেবেছি, এ জাতের ক্ষেপতে দেরি হয়, কিন্তু ক্ষেপলে রক্ষা থাকে না। এদের হৃদয়ে যত বল, এরা তত সরল গভীর বিশ্বাসে আঁকড়ে ধরে থাকে পরিচালককে, সহজে সে বিশ্বাস হারায় না। জাতটি বড় ভাল। বিপ্লবের পর তারা নূতন শিক্ষা নূতন ধারণার মধ্যেও সেই পুরনো হৃদয় হারায় নি। তাই তারা সহ্য করেছে সেই নিষ্ঠুর শাসন, যার নিন্দা বর্তমান শাসকেরা নিজেরাই করেছেন।

এদিক দিয়ে আমাদের দেশের মানুষের সঙ্গে খানিকটা মিল আছে। আমাদের দেশের পাঞ্জাব এবং আরও কিছু-কিছু প্রদেশের

অধিবাসীরা বীর্যে সাহসে পৃথিবীর কোন দেশের কোন মানুষের চেয়ে কম নয়। কিন্তু তবু অভ্যুত্থান সহজে হয় নি বা হয় না। মিল এইখানে। গরমিলও আছে। সে গরমিলের সত্যটা পৃথিবী ধরতে পারে না। বুঝতে পারে না অথচ বিস্মিত হয়, আমাদের কাপুরুষ বলে ব্যঙ্গ করে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের অহঙ্কারকে খুশী করে সন্তুষ্ট থাকে। সেটি আমাদের করুণাধর্ম, আমদের ক্ষমাধর্ম; যার সাধনা ভারতবর্ষের একান্তভাবে ঐকান্তিক এবং নিরবচ্ছিন্ন। যে সাধনার ধারক এবং বাহকেরা উদ্ভূত হয়েছেন গ্রামে, দরিদ্রের ঘরে—হয়ত বা হরিজনপল্লীতে। যে কারণে আমাদের দেশের যাবতীয় বিপ্লব রাজধানী বা কতিপয় নগরে ঘটেই শেষ হয়ে গিয়েছে। বিপ্লব যুদ্ধ রক্তপাত সব করেছেন ধনীরা। নির্ধনেরা নয়। দ্বন্দ্বটা আছে 'নাই'-এর মধ্যে নয়। এমন কি, সিপাহীবিদ্রোহেও নয়, সে বিদ্রোহ বিদেশীর ও বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে। এবং তার কারণও শোষণ নয়। কারণ ধর্ম। সে ধর্মনাশ-ভয়ের ধর্ম, অবশ্য বিকৃত ধর্ম। সে বিকৃতি বহুকালে ঘটেছে, কিন্তু শাশ্বত সেই ভারতীয় মন, যে মন সবচেয়ে ধর্মকে বড় বলে মনে করে। সে মনটি সেখানেও, এই বিকৃত ধর্মকে আশ্রয় করেও সোনার মত খাঁটি। সেই কারণেই এই স্বাধীনতালাভের যুদ্ধে যেখানে ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ক্ষোভে অনেক রক্তস্রোত প্রবাহিত হবার কথা, সেখানে তা হয়নি; একেবারে স্বাধীনতা আসবার সময় সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বে যেখানে ভারতব্যাপী নরমেধ হতে পারত এবং হবার কথা, সেখানেও তা হতে পায় নি; অহিংসাধর্মী ভারতবর্ষের মন গান্ধীজীকে আশ্রয় করে মূর্ত হয়ে উঠেছিল।

ওরা এই মন কোন দিন পাবে কি-না, পেতে চাইবে কি-না জানি না। কিন্তু পেতে ত হবেই। নইলে ওরাই বা এই শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায় কেন? যদি হিংসাই থাকবে, বিদ্বেষই থাকবে, তবে আর সে শ্রেণীহীন সমাজের কোন্ মূল্য? যদি

রক্তপাতে প্রবৃত্তিকে বাঁচিয়ে রাখতে চায় তবে আর ঐক্যে প্রয়োজন কী? তাই সেদিন বার বার এই কথাই মনে হয়েছিল যে, এ মন ওদের একদিন পেতেই হবে। না-পেলে ওদের সার্থকতা আসতেই পারে না। এ-মন পেলে এই হৃদয়াবেগ-সম্পন্ন জাতিটি আশ্চর্য প্রাণৈশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান হবে। জাতিটি বড় ভাল। একটা জিনিস এরই মধ্যে এরা পেয়েছে, সেটা দেখে ঐ আশা বেড়েছে। এদের মধ্যে কালো-সাদা-পীত জাতির বিদ্বেষ নেই; বিদ্বেষ দূরের কথা, অবজ্ঞাও নেই। এটা নিশ্চিত, চোখে দেখেছি, এই কঠিন স্বভাববিদ্বেষ থেকে সোভিয়েট রাশিয়ার মানুষেরা মুক্তি পেয়েছে। সহজ মানবপ্রীতি বড় কঠিন সাধনার বস্তু। নূতন রাজনৈতিক মতবাদ থেকেই এর সৃষ্টি; কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের নিয়মাধীনে থেকে আজ সে অভ্যাস সহজ স্বভাবধর্মে পরিণত হয়েছে। এর মধ্যে রাজনীতি উচ্চ পর্যায়ে যতটুকুই থাক্, সোভিয়েট রাশিয়ার সাধারণ মানুষের এই প্রীতির মধ্যে রাজনীতি নেই।

রাশিয়ানদের প্রকৃতি সম্পর্কে তাদের বর্তমান অবস্থাসম্পর্কে সেদিন ক্রেমলিন প্রাসাদে রাজকীয় রাশিয়ার ঐশ্বর্য দেখতে দেখতে সত্যই এই ধরনের চিন্তায় আমার মন আলোড়িত হয়েছিল। রাশিয়ায় কম্যুনিজম-এর রূপায়ণের পন্থাসম্পর্কে, স্টালিনিজম-সম্পর্কে আমার মন বিরোধী ভাব পোষণ করে, একথা এদেশে সুবিদিত; ওদেশেও লেখকদের কাছে বলেছি। বর্তমানে মার্কসবাদ-সম্পর্কে বড়-বড় ব্যক্তিদের মুখ থেকে অনেক কথাই শুনি এবং আমিও বিশ্বাস করি, মার্কসবাদ জগৎ ও জীবনসম্পর্কে শেষ কথা নয়। তবুও এ কথা ঠিক যে, মার্কসবাদের তত্ত্বগুলি মানবজীবনে ও সমাজে একটি অনতিক্রম্য অধ্যায়। কোন-না-কোন আকারে সে আসবেই। ক্রেমলিনের প্রদর্শিত ঐশ্বর্যসঞ্চয় সে কথা যেন আরও

স্পষ্ট করে তুলে ধরেছিল চোখের উপর। এমন বৈষম্য জীবনের পক্ষে অনাচার, ক্ষয়রোগের মত ব্যাধি। এ ব্যাধি থেকে জীবন নিজেকে মুক্ত করবেই।

সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের কথা মনে হয়েছিল। অহিংস সংগ্রাম এবং ভূদানের কথা মনে করে আনন্দ অনুভব করেছিলাম। সমাজতান্ত্রিক সমাজের রূপায়ণ আজ আমাদের অত্যন্ত দ্রুতগতিতে হওয়ার প্রয়োজন। আইন হচ্ছে, আইন করে জমিদারি-জোতদারি উচ্ছেদ হচ্ছে। আইন-লঙ্ঘনে শাস্তির বিধানও হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। অন্যথায় 'ভূদান' ছিল প্রকৃষ্টতর পন্থা। অহিংস বিপ্লবের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা যেখানে আসে, সেখানে পরবর্তী অধ্যায়ই হল ভূদান—সর্বস্বদান। ভারতবর্ষে অনেক পণ্ডিত আছেন যাঁরা শাস্ত্রজ্ঞ, যাঁরা নমস্য, যাঁরা আজও ক্ষেত্র-বিশেষে যুদ্ধের পক্ষপাতী। যাঁদের রক্তাক্ত বিপ্লবের স্বপ্ন আজও একেবারে মুছে যায় নি ; তাঁদের থেকে আমি পাণ্ডিত্যে ছোট—অনেক ছোট ; তবুও যখন পঞ্চশীলের গৌরবে বিশ্বের দরবারে গৌরবান্বিত আসনসম্পর্কে গৌরব অনুভব করেন, তখন এইটুকুই মনে হয় আমার যে, পাণ্ডিত্যে ছোট হলেও একটি পরম সত্যের উপলব্ধি আমার ভাগ্যক্রমে হয়েছে। যাকে বলে, বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহু দূর—এ আমার তাই। অন্তত বিপ্লবের দেশের লোকের বিপ্লবের এবং বিপ্লবোত্তর সংগঠনের মর্মান্তিক স্মৃতি যখন তাঁদের বুক চিরে দীর্ঘনিশ্বাস টেনে বের করে এনেছে তখন আর এ বিষয়ে সন্দেহ থাকেনি।

কথাগুলি সেদিন এমন গুছিয়ে ভাবি নি ; কিন্তু ভেবেছিলাম। রাশিয়ায় যে নোট-বইটি সঙ্গে ছিল, তাতে অঙ্ক হিসেব তত্ত্ব টুকি নি ; কিন্তু এমনই মনের ভাবগুলি টুকরো টুকরো করে লিখেছিলাম।

যাক, প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে দেখতে গেলাম মস্কোর বিরাট ঘণ্টাটি।

ছেলেবেলায় পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য মুখস্থ করতে হয়েছিল। সে ত পঞ্চাশ-বাহান্ন বছর আগে। তার মধ্যে মস্কোর ঘণ্টা ছিল অন্যতম আশ্চর্য। বিরাট ঘণ্টা সন্দেহ নেই; তিন-চারটি মানুষের উচ্চতার সমান। সঠিক কত ফুট উঁচু, কত তার ব্যাস, কত তার ওজন তা জিজ্ঞাসাও করি নি, ফোটোও সংগ্রহ করি নি; তবে আজ চোখে বিস্ময়ের বিন্দুও ফুটে উঠল না। রাস্তার ধারে ফুটপাথের উপর পড়ে আছে। একটা দিকের খানিকটা অংশ ভেঙে গিয়েছে, মনে হল, ওটাকে একটি পরিবার বেশ আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহার করতে পারে; ভাঙা অংশটা দরজার কাজ করবে। কয়েক শ দর্শকই অহরহ আসছেন, যাচ্ছেন, ফোটো তুলছেন ঘণ্টার সামনে বা পাশে দাঁড়িয়ে। যে গির্জাটির সর্বোচ্চ চূড়ায় ঘণ্টাটি টাঙাবার কথা সেটির নীচের দিকে ছোট-ছোট মিনারেটে আরও অনেক ঘণ্টা টাঙানো রয়েছে। জার কলোকোল পৃথিবীর ইতিহাসে 'কিং অব বেলস্' নামে খ্যাত। তিনিই তৈরী করিয়েছিলেন এই ঘণ্টা।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হল, লোকটি কী কল্পনা করে এগুলিকে তৈরী করেছিলেন? এই ঘণ্টাগুলি একসঙ্গে বাজবে—ঢং-ঢং ঢং-ঢং; এবং সে বাজনা নিপুণ বাজিয়েদের হাতে তালে তালে বাজবে, তার সমবেত ধ্বনি বিপুল হয়ে ছড়িয়ে পড়বে উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে, পশ্চিমে এবং উর্ধ্বলোকও নিশ্চয় ছিল লক্ষ্য। হয়ত সেইটেই ছিল মুখ্য লক্ষ্য। ধ্বনির মধ্য দিয়ে পূজা পাঠানো। মৃত্যুর পর স্বর্গ তিনি নিশ্চয় খুঁজে পান নি; ও ধারণা মিথ্যা। এ যুগের মানুষ তা জেনেছে এবং হতাশায় তার আত্মা হাহাকার করেও বেড়ায় না। তবু একালে দাঁড়িয়ে এইটুকুই মনে হল, সেকালেও ধনসম্পদ, সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠার মধ্যে থেকেও মানুষ যা চেয়েছে তা পায় নি, অতৃপ্ত মনে কিছুর সন্ধান করেছে। একালেও ঠিক তেমনি ভাবেই সে সন্ধান অব্যাহত

আছে, মন্দির না গড়লেও অন্য কিছুর মধ্যে পরিচয় রয়েছে, ওই স্পুটনিকের মধ্যে রয়েছে।

আমরা একদলে ছিলাম চার জন। মিশরের মিঃ সিবাই এবং তাঁর সঙ্গী। চাইনিজ কবি মিঃ উয়ান স্থই পো এবং আমি। আমি বার বার পিছিয়ে পড়ছিলাম। ভাবতে ভাবতেই পিছিয়ে যাচ্ছিলাম। সেদিন স্বীকার করেছি যে, রাশিয়ার মহাবিপ্লব যে ধারায় যে পন্থায় ১৯১৮ সনে সংঘটিত হয়েছিল তা শুধু রাশিয়ার পক্ষেই অনিবার্য ছিল না—সমগ্র বিশ্বের অতীত ইতিহাসের কার্যকারণের পটভূমিতেও অনিবার্য ছিল। মিঃ ভ্লাডিমির এবং শ্রীমতী মেরিয়ন বা মারিয়ম বা মীরা আমাদের সঙ্গে ছিলেন। মীরা বার বার প্রশ্ন করেছে, মিঃ বানার্জি, আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন? হেসে বলেছি, না। তবু স্বীকার করছি দেশের লোকের কাছে যে, আমার মোজা পরা অভ্যাস আদৌ নেই এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে এক নাগাড়ে জুতো পরে থাকারও অভ্যাস নেই, ফলে পায়ের আঙুল এমন টাটিয়ে উঠেছিল যে, হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল। মনে পড়ছিল, ছেলেবেলার পুজোর দিনের কথা। নতুন জুতো মোজায় ফোস্কা পড়ত। খুঁড়িয়ে চলতাম, জুতো ছাড়তাম না। অন্তত পুজোর ক দিন।

ভ্লাডিমির ভেবেছিলেন যে, হয়ত আমি অতিমাত্রায় চিন্তামগ্ন। তিনি হেসে বলেছিলেন, তুমি এঁদের নিয়ে চল মীরা, আমি মিঃ বানার্জিকে নিয়ে যাচ্ছি। মীরা এগিয়ে যেতেই বলেছিলেন—These মীরাজ and নাটাশাজ—you see—বলে একটু হেসে দিয়েছিলেন। জুতো পরে পায়ের কষ্টের সত্যটা ঢাকা পড়ায় আমিও একটু হেসেছিলাম।

বেরিয়ে যখন এলাম তখন ক্রেমলিনের দেওয়ালের সম্মুখে রেড স্কোয়ারে লেনিন এবং স্টালিনের সমাধির প্রবেশদ্বারের সামনে সেন্ট্রি বদল হচ্ছে। অনেক লোক জমেছে দেখবার জন্য। আমরাও

দাঁড়ালাম। দৃশ্যটি অবশ্য দেখবার মত। যত দূর মনে পড়ছে, আধ ঘণ্টা বা এক ঘণ্টা পর পর সেন্ট্রি বদল হয়। এখানে সেন্ট্রির কর্তব্য অত্যন্ত কঠিন। দাঁড়িয়ে থাকিতে হয় পাথরের মূর্তির মত। নাকে মাছি বসলেও তাড়াবার উপায় নেই। অঙ্গ স্থির, দৃষ্টি স্থির —সব স্থির।

এইখানেই মিঃ ভ্লাডিমির আমাকে গর্কীর সমাধি দেখালেন। সমাধির অন্য কোন চিহ্ন নেই, আছে ক্রেমলিন প্রাসাদের বেষ্টনী-প্রাচীরের গায়ে একেবারে ভিতের উপরে একটি ট্যাবলেট। তাতে গর্কীর নামটি পড়তে পারলাম। প্রাচীরের গায়ে পাশাপাশি সারি-সারি ট্যাবলেট। রাশিয়ার মহাবিপ্লবের স্মৃতিবিজড়িত বিশ্ববিখ্যাত রেড স্কোয়ারের একদিকে মহামতি লেনিনের সমাধিস্থলে রক্ষিত তাঁর দেহকে ঘিরে রাশিয়ার বিপ্লবী বীরেরা সমাহিত। বেশ লাগল।

ওখান থেকে ক্রেমলিন প্রাসাদের সামনে এসে বসলাম। তারপর ফেরার পালা। এক গাড়িতে আমরা ছ জন। তার মধ্যে মিশরী বন্ধুরা যাবেন তাঁদের এম্বাসিতে, সেখান থেকে আর কোন্ বন্ধুর বাড়ি নিমন্ত্রণ খেতে। চীনা বন্ধুটি যাবেন মস্কোর একেবারে শহরতলীতে এক বন্ধুর বাড়ি নিমন্ত্রণ খেতে। আমি ফিরব হোটেলে। এ সব ক্ষেত্রে জেতেন তাঁরাই, যাঁরা নিজের প্রয়োজন বড় করে তুলে ধরতে পারেন। এদিক দিয়ে তরুণ মিশরী বন্ধুদুটি পারঙ্গম, কারণ তাঁরা সাহিত্যিকের চেয়ে কূটনৈতিক বেশী। একটা ব্যস্ত ভাবের মধ্যে প্রয়োজনের গুরুত্বটা ফুটিয়ে তোলার অভ্যাসেই তাঁরা ঘড়ি দেখেন আর বলেন, My goodness, we are already late—ও-হো!

তাঁদের নামিয়ে চীনা বন্ধু মিঃ উয়ান স্যুই পোকে পৌঁছে দিতে গেলাম। সে প্রায় গোটা মস্কো পরিক্রমা। এদিকে মিঃ উয়ান স্যুই পোকে ধন্যবাদ, তিনি আমার দেরির জন্য বার বার নিজেকে

অপরাধী মনে করেছেন। চীন দেশের মানুষের এই মনের সঙ্গে আমাদের মনের বড় মিল আছে। তাঁর অপরাধবোধে আমি লজ্জিত হয়েছি। তবে চীনা বন্ধুকে পৌঁছে দিতে গিয়ে সে অঞ্চলে পুরনো কালের বসতি যা এখনও সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলা সম্ভবপর হয় নি তা দেখতে পেয়েছিলাম। এবং একটি নিত্য হাটের বাজারও দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম। পুরনো কালের বাড়িগুলি—যেগুলিকে ওঁরা বলেন স্লাম—সেগুলি কাঠের তৈরী, অত্যন্ত জীর্ণ হয়ে এসেছে। একের পর এক ভেঙে ফেলা হচ্ছে এবং হবে। অবশ্য কিছু-কিছু বাড়ি বা এলাকা কাঠের প্রপের বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে দেখলাম। হাটটি দেখলাম আমাদের কলকাতার বেলগেছে বা টালিগঞ্জের বাজারের মত। রাস্তার দু ধারে সব্জির ভার নিয়ে বসে গিয়েছে সব। গিজ গিজ করছে লোক। থলে হাতে হাউস-ওয়াইফরা বাজার করছেন। গোল আলুর আকারের লাল মূলোগুলোই আলো করে রয়েছে হাটটা। এইসব এলাকায় অপরিচ্ছন্নতা কিছুটা চোখে পড়ল। তবে লোকজনগুলোকে বড় ভাল লাগল। কারণ এমন ভিড়ের মধ্য দিয়ে আমাদের এখানে গাড়ির পথ মিলত না। সঙ্ঘবদ্ধ জনতা মারমুখী হয়ে রুখে দাঁড়াত। কাঁচ-টাচ ভাঙত। কিন্তু ওখানে ওই ভিড়েও পথ মিলল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ভ্লাডিমিরকে, এরা এতে রেগে ওঠে না?

ভ্লাডিমির আশ্চর্য হল। বললে, কেন রেগে উঠবে? আমরা যখন গাড়িতে এসেছি, তখন দূর থেকে গুরুতর প্রয়োজনে এসেছি। ফিরতেও হবে অনেকটা পথ।

অনেকটা পথই বটে। ফিরতে প্রায় একঘণ্টা লাগল এবং যখন ফিরলাম তখন তিনটে বেজে গিয়েছে। সরাসরি এসে খাবার ঘরে ঢুকলাম।

খেয়ে দেয়ে ঘরে গিয়ে মোজা জুতো ছেড়ে পা নিয়ে বসলাম

কড়া কাটতে এবং বুড়ো আঙুলের বসে-যাওয়া নখের কোণ তুলতে। শেষ পর্যন্ত রক্তপাত করে ছাড়লাম।

কিছুক্ষণ পরই মুল্‌ক এবং আকসানা এলেন। বললেন, চল, আজ একটু ঘুরে আসি। গাড়ি করে মস্কো শহরটা ঘুরব।

পা জখম হয়েছে জেনেও 'না' বললাম না। যাবার দিন এগিয়ে আসছে—মস্কো এসেছি, না-দেখে যাব সেটা কেমন কথা! মোজা জুতো পরে নিয়ে বললাম, রেডি। চল।

মতলব ঠিক করে রেখেছিলাম, গাড়িতে উঠেই জুতো থেকে পা বের করে নেব। মানুষ মুখের দিকে চায়, পায়ের দিকে না। মস্কো ক্যানেলের তটভূমি ধরে রাস্তা। ক্যানেল বেয়ে ওয়াটার-ট্রাম চলছে। সুন্দর সুগঠিত ক্যানেল। এর ধারে প্রথম দ্রষ্টব্য যেটি আমার কাছে মনে হয়েছে, এবং বোধ করি সকলের কাছেই হবে, সেটি হল এক বিরাট পার্ক। সেখানে অপরাহ্ণে হাজারে হাজারে রঙিন-পোশাক-পরা তরুণ-তরুণী এবং হাজারে হাজারে মানুষ বিশ্রাম উপভোগের জন্য এসেছে। এটিই প্রাচীন মস্কো শহরের নূতন রূপের আদর্শের প্রতীক। এখানেই নাকি আগে গোটা মস্কো শহরের আবর্জনা ফেলা হত। দুর্গন্ধ আবর্জনাস্তূপ বিষাক্ত করে তুলত ক্যানেলের জল—ভারী অসহনীয় করে তুলত বাতাস। লেনিন প্রথমেই বললেন, এইখানে কর অপরূপ এক পার্ক। শহরের শ্রেষ্ঠ এবং বৃহত্তম পার্ক। আবর্জনার উর্বরতার উপর ফুল ফোটাও। পার্কে ফুলকে ম্লান করে মানুষেরা বসে আছে দেখে সত্যই খুব ভাল লাগল।

পূর্বেই বলেছি, মস্কোর পরিচ্ছন্নতা আশ্চর্য। সমস্ত দেহমন যেন একটি অনাস্বাদিত স্বস্তি অনুভব করে; এবং আশ্চর্য এদের, সবুজ প্রীতি, গাছের প্রতি অনুরাগ। গাছে গাছে সবুজের পাড় দিয়ে যেন মুড়ে দিতে চায় ইটকাঠের নগরীটিকে। রাস্তার পাশে পাশে ফুলের কেয়ারি।

রাস্তায় পড়ল নতুন স্টেডিয়াম। এই কিছু দিন আগে বিশ্ব-যুব-সম্মেলনের সময় তৈরী হয়েছে। ওরই কাছাকাছি মস্কোর বহু পুরাতন এবং বহুখ্যাত নানদের অর্থাৎ সন্ন্যাসিনীদের আশ্রম। এই সোনালী গম্বুজওয়ালা ক্রেমলিনের গির্জের মত গঠন; ভালয় মন্দয় যার ইতিহাস বা ইতিকথা রোমাঞ্চময়। তারপর গিয়ে উঠলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন এলাকায়। এর কথা আগে বলেছি। যাওয়া-আসার পথে কয়েক বারই দেখেছি এবং বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছি। যখনই দেখেছি তখনই মনে হয়েছে এইটিই বোধ করি মস্কোর এবং সোভিয়েটের শ্রেষ্ঠ গৌরবের সংগঠন। সৌন্দর্যে, পরিচ্ছন্নতায়, বিশালত্বে অপরূপ। মস্কো নদীর সু-উচ্চ পাড়ের উপর আলসের ঘের দিয়ে এক দিকের শেষ সীমানা টানা। এর কোলে প্রায় এক শ-দেড় শ ফুট ঢাল নেমে গিয়েছে মস্কো নদীর কিনারা পর্যন্ত। এই ঢালটি গাছে গাছে ছায়াচ্ছন্ন, তলায় তলায় বসবার আসন, আঁকাবাঁকা পায়ে-চলা পথ। ইউনিভারসিটি এলাকা নির্জনতায় শান্ত স্তব্ধ। জনহীন পুরীর মত মনে হচ্ছে। এখন গ্রীষ্মাবকাশ। ছাত্রেরা বিশেষ করে ইয়ং কম্যুনিস্ট লীগের সভ্যরা ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশে। ছড়িয়ে পড়েছে দেশের কাজে। সুদূর সাইবেরিয়া পর্যন্ত চলে গিয়েছে। বিজ্ঞানসম্পর্কে এরা নাকি আশ্চর্য সহজ জ্ঞান আয়ত্তে এনেছে, মজ্জাগত করেছে। কিন্তু অন্য দেশসম্পর্কে নাকি খুব বেশী কিছু জানে না—এ অভিযোগও আছে।

আমরা আলসেতে বুক দিয়ে দাঁড়ালাম। নদীর ও পারে মূল মস্কো নগরীর প্রাসাদশীর্ষগুলি দেখা যাচ্ছে। ক্রেমলিনের সোনালী চূড়া সন্ধ্যার আবহাওয়ায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না, রেড স্টারটি রক্তাভ দীপ্তিতে ঝকঝক করছে।

মুল্‌ক আমাকে একটা খোঁচা দিয়ে বললে, তারাশঙ্কর, হিয়ার ইজ হিউম্যান ট্যাচ—দেয়ার ইউ সি।

অন্য কিছু নয়, একটি তরুণ এবং একটি তরুণী একই আসনে বেশ একটু নিবিড় হয়ে বসে আছে।

আকসানা হেসে বললে, মুল্ক ইজ ভেরি লাকি! হি ইজ দি ফার্স্ট ম্যান টু ডিসকভার অল হিউম্যান টাচেস।

মুল্ক বললে, থ্যাঙ্ক ইউ ফর দি ক্রেডিট ইউ হ্যাভ গিভন মি, মাই ডিয়ার আকসানা। দেয়ারবাই ইউ অ্যাডমিট ছাট আই এম এ রিয়েল রাইটার।

আকসানা বললেন, অবশ্যই স্বীকার করি। কিন্তু দেরি হয়ে যাচ্ছে, আজ 'ইডিয়ট' ছবি দেখতে যাওয়ার কথা আছে।

আমার পাত্রখানি ইতিমধ্যে বেশ টনটনিয়ে উঠেছিল। আমি বাঁচলাম। গাড়িতে এসে আমিই উঠলাম আগে। ঘড়িতে তখন দশটা বাজে বাজে। রাস্তায় আলো জ্বলেছে। আকাশে মেঘও ঘনিয়েছে। জনহীন মসৃণ প্রশস্ত পথখানিও ভিজে ভিজে। তু পাশের গাছগুলি বর্ষণপ্রত্যাশায় থম থম করছে। গাড়ির টায়ারের শব্দ উঠছে—শুনতে পাওয়া যাচ্ছে—এত গাঢ় নিস্তব্ধতা। ক্বচিৎ একটা কি তুটো কি চারটে লোক।

'ইডিয়ট' ছবির কথা আগেই বলেছি। সে দিন ছবি দেখে রাত্রে যখন বের হলাম, তখন বৃষ্টি ঝরছে। সঙ্গে কনকনে হাওয়া। সে কি শীত!

মস্কো শহরে পথে ঘাটে লোকের ভিড়ের অভাবের কথা আগেও বলেছি। অথচ মস্কো শহরে মানুষ এত বেশী যে, তাদের খাদ্য-সমস্যার চেয়েও বড় সমস্যা বাসস্থানের। সে সমস্যা এমন বিপুল যে, হাজার দরুনে বাড়ি ক্রমান্বয়ে তৈরী করেও সাত বছরের আগে তার সমাধান করতে পারবেন বলে কর্তৃপক্ষ আশা করেন না, যার অর্থ হল, বহু লক্ষ মানুষের বাস এই মস্কো শহরে। যদি সত্য মনে

থেকে থাকে, তবে আশি থেকে নব্বই লক্ষ লোকের বাস এখানে। এবং বাসভবনে ভিড় এমনই যে, মস্কো শহরে যারা এ দেশের মফস্বল থেকে আসে তাদের পূর্বাহ্ণে নাকি জানিয়ে আসতে হয় এবং কে কত দিন থাকতে পাবে তা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এই দুটি তথ্য, অর্থাৎ মস্কো শহরে এত লোক ও রাস্তার মানুষের ভিড় কম এবং সাধারণ পরিবহণ-ব্যবস্থার মধ্যেও বিশেষ একটা ঝুলোঝুলি নেই, এ দুটি একেবারে পরস্পরবিরোধী নয় কি ? এ কয়েক দিনে বার বার সে কথা মনে হয়েছিল আমার। মস্কোর বিখ্যাত মেত্রো অর্থাৎ টিউব-রেলওয়ের কথা অবশ্যই শুনেছিলাম, কিন্তু চোখে না-দেখা পর্যন্ত মনে থাকে নি।

পরের দিন মেত্রো দেখবার কর্মসূচী ছিল। কিন্তু ভোরবেলাতক বিছানায় লেপকম্বল মুড়ি দিয়েও কাঁপতে হচ্ছিল। কোন রকমে উঠে দেখলাম, কাচের জানলার একটা ফালি খোলা রয়েছে। মেড খুলে রেখে গিয়েছে যথানিয়মে এবং বাইরের কনকনে বাতাস এসে ঘরে ঢুকছে। ফালিটা শক্ত করে এঁটেসেঁটে বন্ধ করে দিলাম। বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, রাস্তা ভিজে সপসপ করছে, হোটেল-বাড়িটার পাইপ বেয়ে জল নামছে অল্পস্বল্প। গাছপালা-গুলি বাতাসের ঝাপটায় নুয়ে নুয়ে পড়ছে। আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন।

সেদিন টেম্পারেচার হয়েছিল তিন সেন্টিগ্রেড। ফারেনহিটের মাপে ৩৭ থেকে ৩৮ ডিগ্রী—কলকাতায় পৌষ মাসে সপসপে বাদলা হলে বা উত্তর থেকে কোল্ড ওয়েভ এলে যা মধ্যে মধ্যে হয়ে থাকে। এরই মধ্যে যথাসময়ে শ্রীমতী আকসানা এলেন : বানার্জি, আজ মেত্রো দেখতে যাবার ব্যবস্থা। এইটে নাও, পরে ফেল, নইলে তোমার ঠাণ্ডা লাগবে ; বাইরে আজ বেশ ঠাণ্ডা।

তার হাতে ইয়া পুরু গরম কাপড়ের হাল-ফ্যাশানের সেই জামা একটা যা ঝুলে কোমর পর্যন্ত এবং বেল্ট দিয়ে এঁটে রাখার মত কোমরে সেঁটে লেগে থাকে এবং যার কলার ও হাতা শার্টের মত।

আমি বললাম, রক্ষে কর। সেভ মি ফ্রম দিস প্লীজ।

আকসানা বললে, না না বানার্জি, মেত্রো না দেখলে আমরা খুব দুঃখিত হব। তুমি এটা পরে দেখ—

বাধা দিয়ে বললাম, আমি ওই জামাটার কথাই বলছি আকসানা। মেত্রো দেখতে যাব না বলছি না। আমার ওভার-কোটেই হবে, কিছু ভেবো না।

না না বানার্জি, অসুখ হয়ে যেতে পারে তোমার। তোমার শরীর ভাল নয়। সমস্তটা পথ আমার চিন্তার বাকী থাকবে না। কেন? সব অতিথিদেরই এমনিভাবে কাপড়চোপড় এখানে না-নিলে চলে না।

অতিথিদের সম্পর্কে এই যে যত্ন, এ যত্ন সম্পর্কে অনেক জনে অনেক রকম ব্যাখ্যা করে থাকেন। একেবারে যে কর্তৃপক্ষ এসব ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁদের জানিও না দেখিও নি। তাঁরা অবশ্যই রাজনীতিজ্ঞ, এবং রাজনীতি যেখানে, সেখানে কায়ার সঙ্গে ছায়ার মত কূটনীতিও কিছু আছে। থাকুক। সবটা নয়। এবং আকসানার কণ্ঠের কথাগুলি ত নয়ই। সব দেশের মানুষই অতিথিবৎসল, তার মধ্যে আন্তরিকতা অকপট। আতিথ্যে অনেকে কৃত্রিম আতিশয্য আবিষ্কার করে কঠোর বাস্তববাদিতার পরিচয় দিয়ে আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন, কিন্তু আতিশয্য কৃত্রিম কে বললে? আবেগ নয় কেন? থাক তর্ক। আকসানার যত্ন তা কখনই নয়। কেন তা বলি। তার আগে একটি কথা বলে নিই। আকসানার সঙ্গে আমি বোন সম্পর্ক পাতিয়েছিলাম। চীনে আমার দো-ভাষী মি লুর সঙ্গে পাতিয়েছিলাম পিতাপুত্রী সম্পর্ক। পাড়াগেঁয়ে গোঁড়া হিন্দু পরিবারের ছেলে, ছেলেবেলা থেকে একটা সম্পর্ক পাতিয়ে মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করা অভ্যাস। নইলে আড়ষ্ট হয়ে যাই। বছর চল্লিশ বয়স থেকে প্রতিষ্ঠার শুরু আমার, তখন থেকেই কিছু-কিছু চিঠিপত্র আসে; মেয়েরাও

লেখেন। এই অভ্যাসে হয় বোন, নয় মা, নয় কন্যা—একটা সম্পর্ক পাতিয়ে নিয়ে এসেছি বরাবর, আমাদের বংশের এক কর্তা বলতেন—জাত-বসন্ত একবার হলে শতকরা নিরেনব্বুইটি ক্ষেত্রে আর হয় না ; কিন্তু পান-বসন্ত বছরে দু বার হতেও বাধা নেই। সুতরাং সময়ে টিকে নিবি।

আকসানার সঙ্গে যে দিন এই সম্পর্ক পাতাই সে দিনের তার সে মুখচ্ছবি আমার চোখের উপর ভাসছে। প্রথম যে দিন সে এসে আমাকে বললে, মিঃ বানার্জি, মিঃ সুরকভ এবং মিঃ চেকোভস্কি অত্যন্ত দুঃখিত যে, তুমি অসুস্থ হয়েছ এবং অসুস্থ অবস্থায় তোমার অনেক অসুবিধা হয়েছে ; তাঁরা তার জন্য আমাকে তোমার ভার দিয়েছেন। আমি আমার প্রাণপণে তোমার অসুবিধা যাতে না-হয় তা দেখব। অবশ্য জানি না কতটা পারব। বল, কোন ডাক্তারের প্রয়োজন হবে ?

না-না, আমি বলেছিলাম, আমি নিশ্চিন্ত হলাম আকসানা। আমার আর অসুখ নিশ্চয় হবে না।

ইউরোপের দোভাষী মেয়ে সুযোগ পেয়ে তৎক্ষণাৎ রহস্য করে আবহাওয়াটি সরস এবং লঘু করে তুলতে চেষ্টা করেছিল, কেন ? আমার জন্য বলছ ? কিন্তু আমি ডাক্তারও নই—ওষুধও নই। আমি গরীব সামান্য আকসানা মাত্র।

আমি বলেছিলাম, সামন্য গরীব আকসানা—ভাইয়ের বোন হিসেবে অসামান্য স্নেহময়ী। এবং বোনের স্নেহ অনেক যন্ত্রণার লাঘব করে—যা হয়ত ওষুধে পারে না।

সে জাদু হয়ে গিয়েছিল। জাদুর প্রভাব স্থায়ী নয়, কিন্তু একটি নারীহৃদয় ভগ্নীস্নেহ নিয়ে সে দিন থেকে যে যত্ন করেছে আমাকে, তাকে কৃত্রিম আমি কখনই ভাবতে পারি নি। তেমনি সম্পর্ক পাতিয়েছিলাম নাটাশার সঙ্গে।

মুলুক তাকে বলত—রাধা অব কিষেণগঞ্জ। কোন এক রাজপুত-

ছবির রাধার মুখের সঙ্গে নাটাশার মিল আছে। আমি তার সঙ্গেও বোন সম্পর্ক পাতিয়েছিলাম। তারও যত্ন করবার জন্য, স্নেহ প্রকাশের জন্য কী ব্যগ্রতা! কীভাবে সেটা সে প্রকাশ করবে! তার কথা পরে বলব। এইভাবে ওদের মধ্যে দিয়ে সাধারণ রাশিয়ানদের হৃদয় দেখেছি। রাজনৈতিক রাশিয়াসম্পর্কে জোর করে কোন কিছুই বলব না। যা বলব, সে আমার অনুমানের কথা। সে অনুমান জগৎ ও জীবনসম্পর্কে আমার যে উপলব্ধি তার উপর নির্ভর করে বলব। থাক ও কথা, মেত্রোর কথা বলি।

রাশিয়ার টিউব-রেলওয়ের নাম বিশ্ববিখ্যাত। তা, সে খ্যাতি তার মিথ্যা নয়। পূর্বেই বলেছি প্রাচীন মস্কো শহরের গঠন ছিল বৃত্তাকার। টিউব-রেলওয়ের মূল এবং প্রথমটিও তাই বৃত্তাকার। যে স্টেশনে চড়া যাক, মধ্যে কোথাও না-নামলে গোটা শহর ঘুরে সেই স্টেশনেই এসে নামা যায়। পরবর্তী কালে আরও দুটি লাইন হয়েছে, যে দুটি আড়াআড়িভাবে বৃত্তাকার লাইনকে কেটে সোজাসুজি চলে গিয়েছে অনেকটা X অক্ষরের মত। প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর ট্রেন আসছে-যাচ্ছে। যে-কোন স্টেশনে ২৫ সেণ্ট দিয়ে টিকিট কেটে সুড়ঙ্গের মুখে এলিভেটারে দাঁড়ালেই নীচে নেমে যাবেন। প্ল্যাটফর্মের মুখে একটু কৌশলে নেমে গিয়ে দাঁড়ান। ইন্দ্রপুরী। মার্বেল, মোজেক, ফ্রেস্কো, ঝাড়লণ্ঠনে ঝলমল করছে। দুটি স্টেশনে মার্বেল এক রকম নয়, গড়ন নয়, ফ্রেস্কো নয়—প্রত্যেকটি আপন বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট, অপরটি থেকে স্বতন্ত্র। রাশিয়ার পার্বত্যময় প্রদেশে—বিশেষ করে উরালগিরিমালার মধ্যে বহু বিচিত্র মার্বেলের প্রচুর সম্পদ রয়েছে। নানান্ রঙ, নানান্ শেড। মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছি। কিন্তু একদিনের কয়েক ঘণ্টায় কটি স্টেশন দেখব? ট্রেনে চাপলাম। বিপুলবেগে এবং গর্জন করে ছুটল ট্রেন। গতিও বিপুল। ট্রেনের কামরাগুলি সুদৃশ্য, আলোকোজ্জ্বল। দরজাগুলি ট্রেন থামলে আপনি

খোলে, চলতে শুরু করলে আপনি বন্ধ হয়। আমাদের হাওড়া লাইনে যে ইলেক্‌ট্রিক ট্রেন হয়েছে, শুনেছি তা ওই রকমই। আমি হাওড়ার ইলেক্‌ট্রিক ট্রেনে চড়ি নি। সব জানি নে। ওদের ট্রেন একটি ক্লাস। বড়-বড় লম্বা কামরা যার মধ্যে দেড় শ-দু শ লোক ধরে। দাঁড়িয়েও কিছু লোক যাবার ব্যবস্থা আছে। একপাশে দড়ির ঘেরা দিয়ে জন কুড়ি-পঁচিশ লোক বসবার জায়গা আছে; জায়গাটি শিশুবালকসহ মা, বৃদ্ধবৃদ্ধা, রুগ্‌ণদের জন্য নির্দিষ্ট। কেউ অপব্যবহার করে না। এমন কি জায়গা খালি থাকলেও যাঁরা এদিকে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁদের কেউ যান না। আমাকে নিয়ে আকসানা এই অংশে বসলেন। এই পঁচিশ সেণ্টের টিকিট নিয়ে সারাটা দিনই ঘোরা যায় ট্রেনে ট্রেনে। এ লাইন অর্থাৎ বৃত্তাকার লাইন ছেড়ে ওই সোজা লাইনেও যেখানে ইচ্ছে ঘুরতে পারবে ততক্ষণ, যতক্ষণ ওই ভূগর্ভ ছেড়ে উপরে না-উঠবে। উপরে উঠে এলেই টিকিটটি বাতিল। আমরা চড়লাম যখন, তখন দশটা বেজে গিয়েছে; কর্মীদের কর্মস্থলে যাত্রার পালা সদ্য শেষ হয়েছে, এখন চলছেন গৃহিণীরা বাজারে এবং এ কাজে ও কাজে সে কাজে। অর্থাৎ প্রথম যে প্রচণ্ড ভিড়টা হয় তা শেষ হয়েছে। মস্কোর লক্ষ লক্ষ লোকের যাতায়াতের সমস্যা সমাধান হয়েছে এই মেট্রোর অর্থাৎ টিউব-রেলওয়ের কল্যাণে। এবং এই টিউব-রেলওয়ে রাশিয়ার অপর একটি সমস্যার সমাধান করেছে। সেটি আপৎ-কালীন অর্থাৎ যুদ্ধকালের বিমান-আক্রমণের সময় আশ্রয়স্থলের সমস্যার সমাধান। গত যুদ্ধের সময় এইখানেই আশ্রয় নিত মস্কোবাসীরা।

স্টেশনের ফ্রেস্কোগুলি রাশিয়ার ইতিহাস। স্টেশনগুলি ঘুরে এই ছবিগুলি পর পর দেখতে পারলে রাশিয়ার ইতিহাস পড়া হয়ে যায়।

বৃত্তাকার লাইনের শেষ স্টেশন অর্থাৎ যে স্টেশনে উঠেছিলাম

তার আগের স্টেশনটিতে নামলাম এবং আকসানা উপরে নিয়ে এল।

মেত্রোতে একটি ছাত্রের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। হাতে কয়েকখানা বই। আমার কৃষ্ণমূর্তি দেখে এগিয়ে এল। ষোল-সতের বছর বয়স। প্রশ্ন করলে, কোন্ দেশের লোক? ভারতীয়?

ভারতীয় শুনে একসঙ্গে অনেকগুলি প্রশ্ন—আমি কী? অর্থাৎ কী জীবী? নেহরুকে নিশ্চয় দেখেছি, দেখেছি কি-না? তাদের দেশ আমার কেমন লাগছে? আমাদের দেশে মেত্রো আছে কি না? আমাদের দেশের বনে কি অনেক হাতি এবং সে কি খুব বড় বড়?

একে একে উত্তর দিয়ে প্রশ্ন করতে গেলাম—তোমাদের দেশ তোমাদের কেমন লাগে? কিন্তু আত্মসম্বরণ করে প্রশ্ন করলাম, কী কর তুমি? কোথায় যাচ্ছ?

বললে, পড়ি। পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি।

আমি বললাম, আমি তোমাকে শুভকামনা জানচ্ছি। পরীক্ষায় যেন তুমি ভালভাবে কৃতকার্য হতে পার।

সে অভিভূত হয়ে গেল। আমার হাত চেপে ধরে বললে, হাউ সুইট ইউ আর সার্—ইউ আর শো কাইন্ড।

আকসানা বললে, দ্যাট্স ইণ্ডিয়ান সুইটনেস।

আমি আকসানাকে বললাম, ইট ইজ বেঙ্গলস সুইটনেস—ইট ইজ রসগুল্লা।

আকসানা তৎক্ষণাৎ হাত নেড়ে বললে, ও! রসগুল্লা—ইট ইজ ভেরি সুইট।

ছোট্ট ঘটনাটি মনে দাগ কেটে রয়েছে।

একদিন বিকেলবেলা নাটাশা বলে মহিলাটি তাঁর বাড়ি নিয়ে গেলেন। চা খেতে হবে। নাটাশার পরিচয় আগে দিঁয়েছি।

লেখকসংঘের একজন কর্মী। দিল্লিতে সোভিয়েট দূতাবাসে অনেকদিন ছিলেন। স্বামীও এই কাজ করেন। এখন তিনি মস্কোতে উর্দু অনুবাদের কাজ করছেন। একেবারে শহরতলীতে—একটি নতুন বাড়িতে একটি ফ্ল্যাটে থাকেন। শহরতলী ভেঙে বাড়িঘর তৈরী হচ্ছে। ওই সব দশ-বারোতলা হয়ত হাজারত্নয়েক পরিবার বাসের মত বাড়ি সব। ক্রেন উঠে রয়েছে আকাশমুখী হয়ে। রাস্তা-ঘাট এখনও ভাল রকমের তৈরী হয় নি। স্বামী, স্ত্রী, একটি বারো-তেরো বছরের মেয়ে এবং নাটাশার মা নিয়ে সংসার। ওই দুখানি-আড়াইখানি ঘর, রান্নাঘর বাথরুম—এই নিয়ে ফ্ল্যাট। একখানা ঘরে খাবার টেবিল পেতে আগে থেকেই ডাইনিং-রুম হিসেবে সাজানো ছিল। তবে আমার অনুমান এটা তাঁদের ডাইনিং-রুমও নয়। কেন-না, দুখানা ঘরই ওঁদের শোবার ঘর হিসেবে নিত্য-প্রয়োজন। এবং ঘরখানির সাজসজ্জা ডাইনিং-রুমের মতও নয়। পুতুলে ছবিতে বইয়ের আলমারিতে অন্য কথাই বলে। কিন্তু স্থান স্বল্প হ'ক, জিনিসপত্রে সাজসজ্জায় আসবাবে ঘরখানিতে দারিদ্র্য ত নেই-ই বরং জিনিস পত্রগুলির পরিচ্ছন্নতার দীপ্তিতে সৌন্দর্যে বড় চমৎকার শ্রী ফুটে উঠেছে। এই শ্রী—এই কাজেই লিপ্ত 'ভারতীয়-দের' অনুরূপ পরিসরের ফ্ল্যাটে দেখি নি। অথচ রোজগার বোধ করি তাঁদের বেশীই হবে। কারণ তাঁদের বিদেশ থেকে আনা হয়েছে। অবশ্য এটা ইউরোপীয় রুচি এবং পরিচ্ছন্নতারই বৈশিষ্ট্য। আমরা সত্যই ওদিকে ওদের চেয়ে খাটো।

যাবার পর নাটাশার স্বামীর সঙ্গে আলাপ হল। মেয়েটি এসে দাঁড়াল। মেয়েটি পূর্বাঞ্চলের মেয়ের মত লাজুক—শান্ত। বড়-বড় চোখ দুটি নামিয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকে আর মৃদু মৃদু হাসে। ছেলেবেলা দিল্লিতে ছিল—হিন্দী জানত, আমরা হিন্দীতেই কথা বলছিলাম। কিন্তু মেয়েটি ওই একটু সলজ্জ মৃদু হাসি মুখে মেখে আমাদের দেশের মেয়েদের মতই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

ইউরোপের সপ্রতিভতা খুঁজে পেলাম না। নাটাশার মা এলেন। বছর পঞ্চাশেক বয়স ঃ আমাদের দেশের গিন্নীবান্নীদের মতই মিষ্টি তিনি এবং অতিথি আগমনে কৃতার্থ হয়ে যাওয়ার মনোভাব তাঁর। নাটাশা এসে কয়েক মিনিট মাত্র বসেছিল আমাদের মজলিসে, তার পরই সে ব্যস্ত হয়ে উঠে গেল। সঙ্গে সঙ্গে গেল তার মেয়ে। পোশাকের উপরে অ্যাপ্রন পরে রান্নাঘরে ঢুকল। আমরা তার স্বামীর সঙ্গে গল্প করছিলাম। দূতাবাসে সাংস্কৃতিক বিভাগে কাজ-করা ভদ্রলোক, তার উপর ভারতবর্ষেরই একটি ভাষার চর্চা করেছেন বিশেষ বিদ্যা হিসাবে, সুতরাং ভারতীয় অতিথিদের সঙ্গে আলাপ জমে উঠল। তবুও তিনি বার বার নাটাশাকে ডাকছিলেন ঃ কী করছ তুমি ?

মেয়ে এসে বললে, মা রান্নাঘরে কাজে ব্যস্ত। অনেক কাজ।

ভদ্রলোক নিজে উঠে গেলেন এবং ফিরে এসে হতাশ ভাবেই বললেন, উইমেন আর অলওয়েজ উইমেন।

মুলুক বললে, দ্যাট'স ইটারন্যাল।

আমি বললাম, দ্যাট'স দেয়ার সুইটনেস।

পৃথিবীর কোন ইজ্‌ম্‌, কোন ধর্মই নারীর এই শাশ্বত মাধুর্যকে নষ্ট করতে পারে নি। পারলে পৃথিবীর জীবনের মাধুর্যই বোধ করি ফুরিয়ে যাবে। এর পরই নাটাশার আদেশ এল, আমাদের পাশের ঘরে গিয়ে বসতে হবে। সে তার গৃহিণীপনার পরিপূর্ণ রূপটি—যবনিকা উত্তোলনের পরই একেবারে রঙ্গমঞ্চের সুসজ্জিত দৃশ্যপটের মত দেখাতে চায়; মুগ্ধ করে দেয়। সাজঘরে সাজগোজ করা দেখলে অভিনয়ের রঙ ম্লান হয়ে যায়। ভাবটা এই। এও সেই চিরন্তন নারীমনের বাসনা, হয়ত মানুষের মনের বাসনা। না-সেজে সে বেরুতে চায় না, সাজ-করাটা সে দেখাতে চায় না। আতিথ্যেও তাই। এবারও নাটাশার স্বামী বললেন, এও সেই চিরন্তন কম্‌প্লেক্‌স্‌!

যাই হ'ক, পাশের ঘরে গিয়ে বসলাম। মিনিট পনের পর মেয়েটি এসে ডাকলে, ও ঘরে সব তৈরী। গিয়ে দেখি, চায়ের নামে যে আয়োজন করেছে নাটাশা সে প্রায় রাত্রির খাওয়ার আয়োজন। এবং নাটাশাও অ্যাপ্রন ছেড়ে একটু পরিচ্ছন্ন হয়ে নিয়েছে। খাওয়ানোর জন্য সেই চিরন্তন ব্যগ্রতা।

এত কথা বলার হয়ত প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু নাটাশার ওই ছোট নীড়টির মধ্যে সোভিয়েট দেশের পারিবারিক জীবনের যে একটি আভাস পেলাম, তা হয়ত সোভিয়েট সমাজজীবনের স্বরূপ-নির্ণয়ে সহায়ক হতে পারে। দেশ কতটা ভেঙেচুরে নতুন রূপে গড়ে উঠছে সেটা চোখে দেখে যে হিসেবনিকেশ আমরা করি সেই হিসেব নিকেশটা যাঁরা বোঝেন এবং তাই দিয়ে যাঁরা অনুমান করেন, দেশ-সম্পর্কে তাঁরা বিশেষজ্ঞ, আমি বিশেষজ্ঞ নই; আমি মানুষের পারিবারিক জীবনে ব্যক্তিগত জীবনে কতটা ভাঙাচোরা হয়েছে, সেখানে নতুন কী গড়েছে তার রূপটি কী তাই দেখবার চেষ্টা করেছি। তাই নাটাশার ঘরের চায়ের আসরটির কথা বললাম।

আমরা চা খেয়ে বের হলাম। নাটাশাও ফিরল আমাদের সঙ্গে। আমি বললাম, আবার আজ কেন আসছ? সন্ধ্যে হয়ে আসছে। ঘরেই থাক।

উপায় নেই। তার কর্তব্য তাকে করতে হবে। কর্তব্য সেরে ফিরবে হয়ত তখন রাত্রি বারটা বা একটা। হয়ত বাড়ির সকলেই তখন শুয়েছে। তাকেও নিঃশব্দে শুয়ে পড়তে হবে। মানবকামনার চিরন্তন সুখনীড়ের হাতছানি এবং সমাজব্যবস্থায় বাহিরের কর্মচক্রে মানুষকে আকর্ষণে যে দ্বন্দ্ব, সে অবশ্য সকল কালেই আছে। একালে সকল দেশেই নতুন সভ্যতায় এ দ্বন্দ্ব প্রখর হয়ে উঠছে। সাম্যবাদী দেশে নতুন সমাজরূপায়ণে এর রূপ কী হবে তা বলতে পারি নে।

তবে দেখলাম এখনও সমস্যাতেই রয়েছে, সমাধান হয় নি। মুখ বুজে মেনে হয়ত নিয়েছে মানুষ, কিন্তু বুকে বেদনা আছে।

আমরা রাত্রে সিনেমা থেকে ফিরে ডিনার খেয়ে খাবার হল থেকে বেরিয়ে লিফ্‌টের দিকে এগুচ্ছি—সে বেরিয়ে আসছে সামনের ট্রাভলিং এজেন্সির ঘর থেকে। তখন রাত্রি বারোটা পার হয়ে গিয়েছে। চোখে মুখে ক্লান্তির ছাপ। তারই মধ্যে স্মিতহাস্যে মুখখানি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বললে, গুড নাইট।

আমিও বললাম, গুড নাইট।

মুল্‌ক পিছনে ছিল, সে তার দিকে ছুটল ঃ ডক্টর আনন্দ্‌, আমি বসে আছি তোমার জন্যে। বার্লিন থেকে তোমার—

আমি আর অপেক্ষা করলাম না। উঠে গেলাম। লিফ্‌টের মধ্যে একটি তরুণী একখানি বই নিয়ে পড়ছে। পাঁচতলার লাউঞ্জে মেয়েটি নিদ্রাতুর দৃষ্টিতে চেয়ে বসে রয়েছে নিজের চেয়ারে। গিয়ে বললাম, পেঁয়াত আদিন থ্রি।

সে চাবিটি বাড়িয়ে দিল। সমাজজীবন যত জটিল যত বিস্তৃততর যত কর্মমুখর হয়ে উঠছে ততই মানুষের পারিবারিক জীবন সঙ্কীর্ণ হচ্ছে। পরিণতি কোথায় জানি নে। হয়ত ক্ষুদ্র তার ক্ষুদ্রত্বের গণ্ডি অতিক্রম করে বৃহতে মিশে যাচ্ছে—বৃহৎকে বৃহত্তর করছে। কিন্তু এর সঙ্গে অনেক কিছু জড়িয়ে রয়েছে। পরিবারের মধ্যেই মানুষের আসল জীবন, বাইরে তার শুধু কর্মজীবন এবং জীবিকা। হৃদয় সে গৃহেই বসতি করে।

পরের দিন সকালে প্রিপারেটরি কমিটির মিটিংয়ে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছি—এই সময়ে টেলিফোন বাজল। রিসিভার তুলে বললাম, হ্যালো!

বাংলায় প্রশ্ন শুনলাম, আপনি কী—

কথা কেড়ে নিয়ে শুধালাম, শুভময়?

শুভময় রোজ সকালে টেলিফোন করে সংবাদ নিত, কেমন

আছেন ? তারপর বলত, এখন আমি যাব ? আমাকে প্রয়োজন হবে ? হ'ত প্রয়োজন। এই প্রসন্ন শান্ত ছেলেটির মাধুর্যের তুলনা নেই। কথা বলে খুশী হতাম, নিঃসঙ্গতার বেদনা ঘুচে যেত।

আমি বক্তাকে শুভময়ই মনে করেছিলাম। কিন্তু বক্তা বললেন, না মহাশয়, আমি শুভময় নহি।

এবার মনে হল, বক্তা বাঙালী নন—কোন অ-বাঙালী ভারতীয়। প্রশ্ন করলাম, আপনি কে ?

আমি একজন রাশিয়ান, বাংলা শিক্ষা করিয়াছি ও চর্চা করি। আমার নাম হইতেছে শ্রীআলেকজেণ্ডার দানিলচক্। আপনার রচনা অনুবাদের ভার আমি প্রাপ্ত হইয়াছি।

বেশ একটু ভালও লাগল এবং বিস্ময় বোধও করলাম। অবশ্য বিস্ময়বোধের কারণ নেই। শ্রীদানিলচক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। একজন ওরিয়েণ্টালিস্ট, তিনি বাংলা শিখেছেন—নিজের প্রয়োজনে, দেশের প্রয়োজনে। কিন্তু আমাদের দেশে আমরা ইংরেজী শেখার বিস্ময়কর সত্যটা মনে রাখি না। শুধু কি ইংরেজী, আমাদের কত ছেলে যে ফরাসী' জার্মান রাশিয়ান শিখেছে—তার খোঁজ বা হিসেবই রাখি না।

দানিলচক বললেন, আমি কি মহাশয়ের নিকট কিছু সময় পাইতে পারি ?

বললাম, নিশ্চয়, আপনি আজই আসুন। এগারটায় আমাদের প্রিপারেটরি কমিটির অধিবেশন শুরু হবে, তার আগে আসুন।

প্রশ্ন হল, ব্যাঘাত করা হইবে না ত ?

না-না। আপনি আমার বাংলা ভাষা শিখেছেন—ভাল বেসেছেন। আপনি যখন আসবেন, খুশী হব।

দানিলচক এলেন—ঠিক আমাদের দেশের ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের মত মৃদুভাষী এবং বিনয়ী। বিশেষ করে সাধু বাংলায় কথা বলায় ওই তুলনাটিই সর্বাগ্রে মনে আসে। আমার কয়েকবারই মনে পড়ল

আমার পরিচিত কয়েকজন পণ্ডিতকে। মিঃ দানিলচকের এই বৈশিষ্ট্য আমার কাছে বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল—আর-একটি মানুষের উপস্থিতির জন্য। তিনি 'প্রাভদা' পত্রিকার প্রতিনিধি। এসেছিলেন আমার কাছে কতকগুলি প্রশ্ন নিয়ে এবং কতকগুলি মতামত জানতে। ভদ্রলোক ভারতবর্ষে ছিলেন। চটপটে চতুর সতর্কদৃষ্টি সজাগমন তরুণ। এসেই সম্ভাষণাদির পর প্রশ্ন করলেন, ওয়েল মিস্টার ব্যানার্জি, আমি অনেক দিন ইণ্ডিয়াতে ছিলাম। বহুবার কলকাতা গিয়েছি। আশ্চর্য, আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। এবং আপনার নামও ঠিক জানতে পারি নি।

আমি হেসে বললাম, হয়ত তখন আমি ঠিক বিখ্যাত ছিলাম না।

নো-নো, মিস্টার ব্যানার্জি, আই ডিডন্ট্ মীন দ্যাট—

আমি নিজেকে সম্বরণ করে বললাম, অথবা যে পথ ধরে তুমি আমাদের দেশের খ্যাতিমানদের সন্ধান করেছ সে পথের যাঁরা পথিক, তাঁদের কাছে হয়ত আমি খ্যাতিমান নই—অথবা তাঁরা আমার সন্ধান তোমাকে দেন নি, দিতে চান নি। যাই হোক, এবার আমার সন্ধান পেয়ে আমাকে ডাকা হয়েছে আমি এসেছি, তোমার সঙ্গে আলাপ করে খুশী হচ্ছি।

এবার বললেন, আবারও ভারতবর্ষে যাব। এবার নিশ্চয় আপনার বাড়ি যাব।

বললাম, লেট মি এক্সটেণ্ড মাই ওয়েলকাম ফ্রম টু-ডে।

থ্যাঙ্ক ইউ, সার্।

প্রশ্নোত্তর সেরে নিয়ে চলে গেলেন তিনি। বলে গেলেন, প্রাভদার ফোটোগ্রাফার এসে আপনার ছবি নেবে। অনুগ্রহ করে কিছু সময় দেবেন।

এর পর মিষ্ট মৃদুভাষী দানিলচক সবিনয় হাসির সঙ্গে বললেন,

আমি অত্যন্ত আনন্দিত মিঃ ব্যানার্জি, নিজেকে ভাগ্যবান মনে করিতেছি, আপনার সঙ্গে আলাপ করিতে পাইলাম।

বললাম, এ কী কথা বলছেন? আপনি পণ্ডিত লোক—অধ্যাপক। আলাপ যদি সৌভাগ্যের কথা হয়, তবে এ সৌভাগ্য দু জনেরই। তবে আমরা বলি—মানুষের সঙ্গে মানুষের পরিচয়ের মূল্য সৌভাগ্যে নয়—আনন্দে। পরিচয় অর্থ জানাশোনা—কিন্তু তার গভীরের অর্থ হল মিলন। নয় কি?

অবশ্যই। অধ্যাপক দানিলচক একটু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেনঃ সুন্দর কথা! সুন্দর কথা!

আমি কথাটা চাপা দিয়ে প্রশ্ন করলাম, কিন্তু এমন বাংলা আপনি শিখলেন কেমন করে?

দানিলচক উত্তর দিলেন, ইহা বলিতে আমি গৌরব অনুভব করিতেছি যে, অধ্যাপক স্বর্গীয় প্রমথনাথ দত্ত মহোদয় আমার গুরু ছিলেন।

প্রমথনাথ দত্ত মস্কোতেই বাস করেছিলেন এবং তাঁর চেষ্টাতে ও নেতৃত্বে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রবর্তন হয়েছিল। অতঃপর দানিলচক একটি বইয়ের প্যাকেট খুলে আমার কয়েকখানি গ্রন্থসংগ্রহ বের করে টেবিলের উপর রাখলেন, বললেন, আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি যে, আপনার গল্পের অনুবাদের ভার আমার উপরেই প্রদত্ত হইয়াছে। আপনি নিজে গল্পগুলি পছন্দ করিয়া দিলে খুশী হইব। এবং যদি আমাকে গল্পগুলি সম্বন্ধে কিছু বলেন—

সে সম্বন্ধে আলোচনার পর কয়েকটা প্রশ্ন করেছিলাম তাঁকে। বাংলা থেকে রাশিয়ানে অনুবাদের সময় তাঁরা বাঙালী অনুবাদক যাঁরা আছেন, তাঁদের সাহায্য নেন কি-না। উত্তর পেলাম ক্ষেত্রবিশেষে নিয়ে থাকেন—অর্থাৎ যে স্থানগুলি ঠিক বুঝতে পারেন না সেই স্থানগুলি বুঝে নেন। পরে জেনেছি,

পিসশাশুড়ী মাসশাশুড়ী সই সাঙাত বা দেশজ শব্দে ঠেকলে অর্থ বুঝে নেন। কিন্তু বাঙালীদের কাছেও শুনলাম না, দানিলচকও বললেন না, ভারতবর্ষীয় ভাবনার উপলব্ধিসাপেক্ষ চিন্তা যা বাক্যের ঠিক অর্থে প্রকাশ হয় না, ব্যঞ্জনায় প্রকাশ হয়, যা রবীন্দ্র-কাব্যের এবং গানগুলির প্রাণধর্ম সেখানে তাঁরা পরামর্শ করেন কি-না। যতটুকু বুঝেছি, তা তাঁরা করেন না। রাশিয়ান জানি না, অনুবাদ কী দাঁড়িয়েছে বলতে পারব না। মনে পড়েছিল, রবীন্দ্রনাথ জীবিতকালে টমসনের রবীন্দ্রকাব্য ব্যাখ্যা এবং বাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত তাঁর প্রতিবাদের কথা।

আরও প্রশ্ন করেছিলাম, অনুবাদের গ্রন্থ তাঁরা নির্বাচন করেন কোন্ পদ্ধতিতে? গ্রন্থ পড়ে করেন না এটা নিশ্চিন্ত। গ্রন্থ-কারের খ্যাতি শুনেই করা হয়। কিন্তু সেখানেও দেখি পর্যায়ক্রম ঠিক নেই। সোভিয়েট নানান্ দেশের খ্যাতিমান লেখকদের গ্রন্থ অনুবাদ করে এক বিরাট রাশিয়ান সাহিত্য রচনার পরিকল্পনা করেছেন—এ বিষয়ে সন্দেহ করবার হেতু থাকা উচিত নয়। এবং তাঁদের নবজীবন-দর্শনের সমর্থক গ্রন্থই বেছে নেন তাতে অন্যের আপত্তি তাঁরা নিশ্চয়ই শুনবেন না। কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে এ আপত্তিরও কারণ নেই সে ক্ষেত্রেও দেখেছি—নির্বাচনে নিঃসংশয়ে হয় পক্ষপাতিত্ব বা ভ্রান্তি আছে। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এসব নাম জানায় কে? পাঠায় কে? কারণ কিছু ক্ষেত্রে এমন হয়েছে যে, আকাশ-পাতাল ভেবেও কূলকিনারা করতে পারি নে।

উত্তর ঠিক দিতে পারেন নি দানিলচক। 'প্রাভদা'র প্রতিনিধির সঙ্গে কথাবার্তাগুলি মনে পড়ল নতুন করে। শেষ প্রশ্ন করলাম, বলতে পারেন, যেসব বই অনূদিত হচ্ছে তার লেখকদের প্রাপ্যসম্পর্কে কী ব্যবস্থা হয়েছে? আমি আমার সম্পর্কে প্রশ্ন করছি না, আমার বন্ধু শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের একখানি গল্পগ্রন্থ আপনারা প্রকাশ করেছেন। শ্রীযুত মিত্র আমাকে এ

কথাটা জানতে বলে দিয়েছিলেন। এবং শুনেছি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' নামক উপন্যাসও এ দেশের ভাষায় বেরিয়েছে। বন্দ্যোপাধ্যায় মারা গেছেন—তাঁর স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদের অর্থের প্রয়োজন আছে।

দানিলচক অসহায়ের মত বললেন, এই সম্পর্কে আমি কিছু জানি না। বলিতে পারিব না।

তবে প্রসঙ্গক্রমে বললেন, প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পগ্রন্থ ওখানে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বোধ করি প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে গিয়েছে বা অচিরেই হবে।

বাংলা সাহিত্যের আসরে এই সংবাদ নিঃসন্দেহে স্মরণীয় সংবাদ। কিন্তু মানিকবাবুর 'পদ্মানদীর মাঝি'র অনুবাদের কোন সংবাদই অধ্যাপক মহাশয়ের কাছে পাই নি। আমার একটি বা দুটি গল্প ১৯৪৮-৪৯ সনে ও-দেশে ভাষান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল, তার মধ্যে 'তারিণী মাঝি' অন্যতম। এ গল্পটি সদ্য বাংলায় পড়ে দানিলচক বললেন, হ্যাঁ, এটি আগে প্রকাশিত হইয়াছিল।

আজ রাশিয়ার জনসাধারণ প্রায় সকলেই শিক্ষিত। সুদূর পূর্বে মধ্য-এশিয়ার পার্বত্য ও মরুময় দেশগুলিতেও শিক্ষার ব্যাপক প্রসারে তাঁরা কৃতকার্য হয়েছেন। এটা একটা বিরাট কৃতিত্ব। আজ শিক্ষার ক্ষুধা মেটাবার জন্য লক্ষ-লক্ষ বইয়েও সঙ্কুলান হবে না। আরও বেশী প্রয়োজন। এ ক্ষুধা আগে যেভাবে রাশিয়ায় মিটত—এখনও অন্য দেশে যেভাবে মেটে—সে ভাবনার তাঁরা মোড় ফেরাতে চান, ও দিকটা একরকম পাঁচিল গেঁথে বন্ধও করেছেন। ধর্মমূলক চিন্তার কথা—ঈশ্বরভাবনার কথা বলছি। অবশ্য রাশিয়ায় গির্জা প্রথম একেবারে বন্ধ করে থাকলেও পরে আবার খোলা হয়েছে। যাঁরা ইচ্ছা করেন তাঁরা সেখানে যেতে পারেন ; যা শুনেছি, তাতে যাঁরা যান তাঁরা অধিকাংশই প্রৌঢ়া

বৃন্দার দল, কিন্তু সাধারণভাবে লোকে যায় না। এইটেই সাধারণ অবস্থা। ঈশ্বরচিন্তার একটি স্বাদ আছে। অজানাকে জানার এবং অহংয়ের ও সৃষ্টির বা জীবন ও জগৎকে জানার যে আদিম সহজাত তৃষ্ণা মানুষের মধ্যে আছে, তা এই স্বাদেই মেটে। এ তৃষ্ণা আদিম তৃষ্ণা, এ মুছবার নয়, একে মেটাতেই মানুষের সকল সন্ধান। আজ রাশিয়ায় বিজ্ঞানশিক্ষার সুবিপুল প্রসারের ফলে দুর্জ্ঞেয়কে জানার সুবিধা হয়েছে; কিন্তু তৎসত্ত্বেও এক অজ্ঞেয় থেকে যায়। যার জন্য বিজ্ঞানীরাও সন্ধান করে ফিরেছেন —তার শেষ নেই। এই তৃষ্ণা নাচে মেটে না, গানে মেটে না, আহারে মেটে না, দাম্পত্যসুখে মেটে না, মদ্যপানে মেটে না, এমন কি হিমালয়শৃঙ্গে উঠেও মেটে না। এবং শিক্ষার ফলে এর বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক। তাই রাশিয়ায় অনেক বইয়ের প্রয়োজন—তার নূতন স্বাদ চাই। তাই দেশদেশান্তরের পুস্তক তাঁরা অনুবাদ করছেন এবং বাছাই করেই করছেন—সে খুবই ভাল কথা। নিজের দেশের সাহিত্যের অসাধারণ পুস্তকগুলি একবার বন্ধ করেছেন; আবার তাকে প্রকাশ করছেন। বলছেন, বন্ধ করা ভুল হয়েছিল। এর মধ্যেও তাঁদের ঐকান্তিক আকুতির পরিচয়ই প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে আর-কিছু থাকলে সেটা সার্থক বা মঙ্গলজনক হবে না-বলেই আমার বিশ্বাস। এবং ওই পরমতৃষ্ণা মেটাবার মত সাহিত্য বস্তু সৃষ্টি করতে না-পারলেও তা হবে না। যেমন বাইবেল। এককালে একখানি বই—এই বাইবেল, ইউরোপের সমস্ত লোকের এই তৃষ্ণা-উপশমে যা করেছে—তার মত কিছু চাই।

এই প্রসঙ্গে রাশিয়ার সাহিত্যসম্পর্কে আর কয়েকটি কথা বলব। এই পরমতৃষ্ণা মেটাবার মত কোন নূতন উপলব্ধি বা হৃদয়াবেগের মহত্তম প্রকাশের ভাবনা তাঁরা পান নি বলেই রাশিয়ার পুস্কিন চেকভ টলস্টয় দস্তয়েভস্কি গর্কীর ঐতিহ্যময়

সাহিত্যে বিপ্লবোত্তর যুগে চল্লিশ বছরে মাত্র দু-তিনখানি বা চারখানি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি হয়েছে। বড়-বড় লেখক একবার একখানি সার্থক সৃষ্টিতে দেখা দিয়েই কোথায় যেন লুকিয়ে যাচ্ছেন। কেন? এই প্রশ্ন কি মনে ওঠে না? মিঃ শোলোকভের মত লেখক 'অ্যাণ্ড কোয়ায়েট ফ্লোজ দি ডন' লিখে হঠাৎ দীপ্যমান হয়ে উঠলেন। তারপর 'ভারজিন সয়েল আপটার্নড' লেখবামাত্র মনে হল—দীপ্তি ম্লান হয়ে আসছে। তারপর মিঃ শোলোকভের সংবাদ পাই, কিন্তু তাঁর কোন সৃষ্টির সংবাদ নেই। সম্প্রতি শুনলাম, এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তিনি একখানি ভাল বই লিখেছেন। উপন্যাস ঠিক নয়—বড় গল্প। বইখানি পড়ি নি, গল্প শুনলাম। গল্পটি ভাল, কিন্তু অসাধারণ কিছু বলে মনে হল না। মহৎ হলেও মহত্তম বলবেন না কেউই। গল্পটি এই।—যুদ্ধের পূর্বে একজন রাশিয়ান, সম্ভবত মেকানিক বা মোটর-ড্রাইভার একটি মফস্বল-শহরে তার নীড় বাঁধল; সে দেখা পেয়েছিল এমন একটি মেয়ের, যাকে পেয়ে তার জীবনের সব ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় সুধা মিলেছিল। সেই নীড়ে এল একটি শাবক। একটি সুকুমার শিশু এসে ঘর করলে স্মিতহাস্যে আলোকিত এবং কলহাস্যে মুখরিত। আকাশে যে ফুল ফোটে সে ফুল হল বাস্তব, ফুটল ঘরের আঙিনায়। এই সময় এল যুদ্ধ। নায়ক গেল যুদ্ধে। নায়িকা কাঁদল। সে তিরস্কার করলে, ছি-ছি-ছি! আমার দেশ, আমার রাশিয়া বিপন্ন—মা ডাকছে, আর তুমি কাঁদছ? নায়িকা চোখের জল মুছল। নায়ক চলে গেল। গুলি-গোলা-বারুদ-মার্চ-যুদ্ধ। আকাশে শত্রু-বোমারু গর্জন করে ওড়ে। নীড় ভাঙে, শহর ভাঙে। তারই মধ্যে চলে কঠিন শপথের যুদ্ধ। যে শপথ মানুষ নিলে মানুষ হারে না, হারতে পারে না—এ সেই শপথের যুদ্ধ। যুদ্ধে জয় আসে, আসে শীতশেষে বসন্তদিবসে রিক্তশাখায় পুষ্প-সমারোহের মত। উল্লাস—উল্লাস—উল্লাস। সেই উল্লাসের

স্বপ্নের মধ্যে মনে পড়ে প্রিয়জনের মুখ—বিষণ্ণ—তারপর হেসে প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে ওই পত্ররিক্তা শাখার পুষ্পসমারোহের মত। মনে পড়ে ঘর। শান্ত স্নেহময় নিজস্বতার পরিবেশের মধ্যে একটি আরামদায়ক ক্লান্তিহরা শয্যা। যে শয্যায় শুয়ে গান গাইতে গাইতে সে ঘুমিয়ে পড়বে। সারা যুদ্ধের কঠিন শ্রমের ঘুম। তার মধ্যে সুখস্বপ্ন। তারা দলে দলে ঘরে ফেরে। কিন্তু কোথায় ঘর? ঘর নেই, তার বদলে সেখানে একটা গভীর গর্ত—বোমা পড়েছিল। ঘর গিয়েছে, তারা কই? স্ত্রী-পুত্র? স্ত্রী মারা গিয়েছে। ছেলে বেঁচে আছে, কিন্তু কোথায় কেউ জানে না। যুদ্ধের অনাথ—পথে পথে বেরিয়ে চলে গিয়ে কোথায় আছে কেউ জানে না। আরম্ভ হয় ছেলেকে খোঁজা। পথে পথে—আশ্রমে আশ্রমে। ক্লান্ত হয়ে আসে একদিন। নেই—পাওয়া গেল না, যাবে না। হঠাৎ একটি বালকের সঙ্গে দেখা হল, সে খুঁজছে তার বাপকে। কিন্তু পাচ্ছে না। ক্লান্ত মানুষটি তুলে নেয় ছেলেটিকে, বলে, আমিই ত। আমি যে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। অকস্মাৎ একদিন দেখা হয় লেখকের সঙ্গে। এক রেঁস্তোরায় বসে লেখককে সে তার জীবনকাহিনী বলে। বলে, আরম্ভ করেছি নতুন জীবন ওই অজ্ঞাতপরিচয় ছেলেটিকে নিয়েই। ঠিক এই সময় এসে হাজির হয় ওই ছেলেটি, ডাকে—পা—পা!

নায়ক ওঠে, বলে, মিঃ রাইটার, আর না। আমি উঠলাম। ও এসে পড়েছে।

এমন কাহিনী যুদ্ধের পটভূমি বাদ দিয়ে বাংলা দেশে আগে লেখা হয়েছে। শরৎচন্দ্রের 'পণ্ডিত মশাই'য়ের শেষ এতেই। আমার 'গণদেবতা'র দেবু পণ্ডিতের প্রথম জীবন শেষ এতেই। নতুন কিছু নয়। তবে কে কতটা অসামান্য করে তুলতে পেরেছেন কথা সেখানেই। বই পড়ি নি। গল্প যা শুনেছি, যা লিখলাম তার থেকেও সংক্ষিপ্ত। এবং সংক্ষেপে বর্ণনা করবার সময় আমি

আমার নিজের আবেগ দিয়ে লিখেছি। টলস্টয় এবং দস্তয়ভেস্কির সেই গভীর তৃষ্ণাতুর জীবনাবেগ আজ রাশিয়ায় চলিত নয়, তাকে বর্জন করেই তাঁরা চলতে চান—ভয় আমার সেইখানেই ; ওই পরমতৃষ্ণা মেটানোর স্বাদ ওখানে এসেছে কি ?

আর-একটি লক্ষণীয় বিষয় আছে। সেটি হল এই ঃ

শোলোকভের অবিস্মরণীয় 'অ্যাণ্ড কোয়ায়েট ফ্লোজ দি ডন' ১৯১৮ সনের বিপ্লব নিয়ে লেখা। সেখানে জীবনাবেগের মহাবন্যায় প্রলয়ঙ্কর ঝড়ে ন্যায়-ক্ষমা-কারুণ্য—সব মানুষের তৈরী-করা ঘরের চালের মত, সযত্নে তৈরী-করা বাগানের মত ভেঙে চুরে উড়ে যাচ্ছে। মিশিয়ে যাচ্ছে মাটিতে। রক্তাক্ত বন্যা প্রবলবেগে বয়ে চলেছে। ঝড় সমভূমি করে দিয়ে যাচ্ছে সব। এ ঝড় এ বন্যা উঠেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রচলিত অন্যায়-অত্যাচার-শোষণের বিরুদ্ধে—ক্ষোভের ফলে, ক্রোধের ফলে। মানুষ সেখানে আদিম জীবনের পর্যায়ে চলে গিয়েছে। সেখানে ক্রোধ আছে হিংসা আছে—জীবনমরণ-জ্ঞানহীন উন্মত্ততা আছে। ন্যায়-অন্যায় ক্ষমা করবার প্রশ্নই নেই। তার একটা স্বাদ আছে। সে রুদ্রের হলাহল-পানের স্বাদ।

আবার এই দ্বিতীয় সার্থক বই তিনি লিখেছেন—এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মাঝখানটা সৃষ্টির ক্ষেত্রে বন্ধ্যা। এরই-বা কারণ কী ?

এর কারণ কি এই যে—রাশিয়ায় মানুষের জীবনাবেগ এই দুই ক্ষেত্র ছাড়া স্তব্ধ এবং মূক ? তার প্রকাশ হয় নি কোন কারণে ? অবশ্য স্টালিনের যুগে যে তা স্ফুরিত হতে পায় নি তার স্বীকৃতি আমরা বর্তমান রাশিয়ার প্রধানের উক্তি থেকেই পেয়েছি। দ্বিতীয় কারণ হতে পারে যে, এই জীবনাবেগ নানান্ ক্ষেত্রে যেভাবে প্রকাশ পেতে চেষ্টা পেয়েছে তাকে রূপ দেবার অধিকার বা পথ লেখকদের ছিল না। হয়ত-বা দুটোই সত্য।

অপর-একটি উজ্জ্বল সৃষ্টি 'ফল অব প্যারিস'। এই সৃষ্টি উজ্জ্বল বটে, কিন্তু আমার মতে 'অ্যাণ্ড কোয়ায়েট ফ্লোজ দি ডন'-এর মত উজ্জ্বল নয়। জ্যোতির্ময়তার কথা তুলবই না। এ যুগে শিখার কলুষহীন আলো জ্বালার উপাদানকেই আমরা একটি বিচিত্র লজ্জায় আবর্জনাস্তূপে বিসর্জন দিয়েছি। 'ফল অব প্যারিস'ও তাই, যুদ্ধের সময়ের লেখা। এবং তারপর বা তার আগে মিঃ ইলিয়া এরেনবুর্গের এমন কোন সৃষ্টি আছে যার নাম আমরা করতে পারি ?

অপর-একটি বই সম্পর্কে সোভিয়েটবিরোধী মহল থেকে খুবই আলোচনা হয়েছে। তাঁরা একে একটি বিশেষ সৃষ্টি বলে সমাদর করেছেন এবং বইখানি সরকার থেকে বন্ধ করা হয়েছে বলে সরকারের নিন্দাও করা হয়েছে। 'নট বাই ব্রেড অ্যালোন' বইখানির নাম। লেখকের নাম আমার স্মরণ নেই। সোভিয়েটের সমালোচনা আমি করে থাকি। কিন্তু মনকে দলবাদের উগ্রতা থেকে মুক্ত রেখেই করতে চাই। বইখানি পেলে নিশ্চয় পড়তাম, কিন্তু পাই নি। তবে যে সমালোচনার সূত্র বা সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে বইখানিকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে তা পড়েছি। এই কথা নিঃসঙ্কোচে বলছি যে সমালোচনার এই সূত্র বা সিদ্ধান্ত আমার মতে সাহিত্যবিচারের নির্ভুল ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত। এখানে আবার বলে নিই যে, এই সিদ্ধান্ত অনুসারে 'নট বাই ব্রেড অ্যালোন'-এর উপর যে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে, তা ঠিক প্রযোজ্য কি-না, বইখানি ঠিক ওই দায়ে দায়ী কি-না বলতে পারব না—কারণ বইখানি ত আমি পড়ি নি। এই সিদ্ধান্তের মর্ম এই যে, প্রতি বস্তু বা ঘটনা অর্থাৎ জীবনেরই দুইদিক আছে। দুটি দিকেই পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করে চলেছে। অন্ধকার এবং আলোর মত, মন্দ এবং ভালর মত। তাই শুধু ভাল বা শুধু মন্দ একটা দিকই যেখানে দেখানো হয় এবং সেইটে ছাড়া অন্য দিকটা আদৌ জীবনে বা বিষয়ে

নেই বলে জোর দিয়ে প্রকাশ করা হয় সেটা আঙ্কিক নিয়মে অর্ধ-সত্য এবং সত্যের সংজ্ঞা অনুসারে সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা, যেহেতু সত্য সর্বসময়েই সত্য এবং পূর্ণ। সে খণ্ডিত হলে আর সত্য থাকে না, থাকতে পারে না, মিথ্যাই হয়ে যায়। হয় সেটা স্তাবকতাপূর্ণ মিথ্যা অথবা বিদ্বেষ-অনুপ্রাণিত বিপরীতধর্মী মিথ্যা হয়ে যায়।

একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করি। বাংলা দেশে ব্রাহ্মধর্মের প্রথম আবির্ভাবের কালে—রক্ষণশীল সমাজ এই নব জীবনান্দোলনের বেগে বিচ্যুত হয়েছিল—ক্রুদ্ধ হয়েছিল। তাকে সে আঘাত করতে চেষ্টা করেছিল। ব্রাহ্মধর্মও একেবারে যে ন্যায়ের তুলাদণ্ড ধরে ওজন করে আঘাত হেনেছিল, তা নয়। এই আঘাত-প্রতিঘাতের চেষ্টা সাহিত্যের মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করেছিল বেশী। সেই প্রচেষ্টার অন্যতম নিদর্শন হিসাবে 'মডেল ভগিনী' নামক একখানি উপন্যাসের কথা তুলেই এই সমালোচনার ধারাটিকে আমি কেন সত্য বলে মনে করি, সেই কথা বলব।

'মডেল ভগিনী' বইখানিতে ব্রাহ্মসমাজের নারী-স্বাধীনতা এবং ব্রাহ্মসমাজের নারী-পুরুষের স্বাধীন মেলামেশা এবং আচার-বিচারকে অতিরঞ্জিত করে যে কদর্য চিত্র অঙ্কিত করা হয়েছিল, তা সে সময়ে সমাজে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছিল এবং নির্ভীক লেখক এক নিষ্ঠুর সত্যকে তুলে ধরেছেন বলে বাহবা পেয়েছিল। হয়ত সে সময় ব্রাহ্মসমাজে এই স্বাধীনতা ও উদারতা প্রাথমিক উগ্রতায় —উগ্রভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছিল। কিন্তু ওইটুকুই ব্রাহ্মসমাজের সবটা নয়। ওইটুকু ধরে ব্রাহ্মসমাজকে বিচার করতে গেলে মিথ্যাকেই সত্য বলা হবে। এই নূতন ভাবনার মধ্য থেকেই আমরা রবীন্দ্রনাথকে পেয়েছি। জগদীশচন্দ্রকে পেয়েছি। শুধু তাই নয়—পৃথিবীর একেশ্বরবাদের চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে—হিন্দুধর্মের বহু দেবদেবীর মহিমা—সেই চণ্ডীর উপাখ্যানের মত ব্রহ্মের মহামহিমা নতুন করে আত্মপ্রকাশ করে ভারতবর্ষের সাধনার

সম্মান রক্ষা করেছে। 'মডেল ভগিনী' তৎকালীন বহু প্রশংসা সত্ত্বেও আজ কোথায় হারিয়ে গিয়েছে, কেউ মনে করতে পারে না। নূতন কালেও তার পুনরাবৃত্তি হয় না, বা হচ্ছে না তা নয়। কিন্তু সেও থাকবে না। রুশ দেশেও—অভিজাত সমাজকে সর্বাঙ্গ কুৎসিত করে যেখানে আঁকা হয়েছে—যা এমনি একপেশে এবং অর্ধ-সত্য—তাও মরছে এবং মরবে। জগতে তার প্রতিষ্ঠা হয় না ও হবে না। কোনও অনাগত কালেও হবে না তা ধ্রুব সত্য।

সোভিয়েট সাহিত্যের এই সিদ্ধান্ত কিভাবে প্রয়োগ করা হয় আমি জানি না। তবে তার সঙ্গে আমার বিরোধ নেই। তবে প্রশ্ন জাগে, কেন—কেন সাহিত্যে নব-নব প্রকাশ নেই? এবং অনুবাদের ক্ষেত্রে কেন এমন হয় যে, মনে প্রশ্ন জাগিয়ে তোলে—এত বই থাকতে এই বইটি বা লেখকটি কেন অগ্রাধিকার পেলেন?

মিঃ দানিলচক বিদায় নিলেন; এই বিনয়ী মিষ্টভাষী পণ্ডিত ব্যক্তিটির সঙ্গে আলোচনা করে সত্যই খুশী হলাম। তখন মুল্‌ক এবং আকসানা দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত। আমাদের প্রিপারেটরি কমিটির অধিবেশনের নির্দিষ্ট সময়ের আর দশ-পনর মিনিট বাকী। অধিবেশন এই হোটেলেই দোতলায় একটি হলে অনুষ্ঠিত হবে। দোতলায় লিফ্‌ট্ থামে না। একতলা পর্যন্ত নেমে এসে আবার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়। গোটা দোতলাই অধিবাসীশূন্য। এক-তলাটা নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। মিটিং হল্, রেডিয়োর জন্য বিশেষ ব্যক্তিদের বক্তৃতা রেকর্ডিংয়ের বিভাগ, এবং বোধ করি লণ্ড্রি ইত্যাদি হোটেলের অবশ্য-প্রয়োজনীয় বিভাগগুলির জন্য গোটা তলাটাই নির্দিষ্ট।

কমিটি মিটিং বসল যে ঘরে, সে ঘর অবশ্যই চমৎকার। বড়-বড় হোটেলে এই ধরনের হল্ সাজনোই থাকে। সব দেশের বড়

হোটেলে আছে। মিটিং বসল—তারিখ ২রা মে। ছটি দেশের প্রতিনিধি দশ জন। এবং সোভিয়েট লেখকসঙ্ঘের ভারপ্রাপ্ত কর্মীরা নানান্ কাজে সাহায্য করবার জন্যে উপস্থিত রইলেন। আমাদের পাশে পাশে বসলেন দো-ভাষীরা। আর বসলেন শর্টহ্যাণ্ড নোট নেবার জন্য কয়েক জন। এঁদের সকলেই মহিলা। সংবাদ-পত্রের প্রতিনিধিরা এক পাশে বসলেন। প্রথম সভাপতি হলেন তাসকেন্দের বিশিষ্ট লেখক মিঃ শারফ রশিদভ। অর্থাৎ রশিদের পুত্র শারফ। 'ভ' শব্দটি অপত্যার্থে প্রযুক্ত হয়, যেমন দশরথের পুত্র দাশরথি, গোতমীর গৌতম, তেমনি রশিদের অপত্য 'ভ' শব্দ যোগ করে হল রশিদভ। প্রথমেই উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন, এ সম্মেলন দিল্লির এশিয়ান লেখক-সম্মেলনের দ্বিতীয় অধ্যায়। উদ্দেশ্য সেই এক। আজ পৃথিবীর লেখকদের পরস্পরের সঙ্গে পরিচয়ের প্রয়োজন গভীরভাবে অনুভব করি আমরা। সকল ধর্মনৈতিক, রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক পার্থক্যের বিভেদের উর্ধ্বে দাঁড়িয়ে মানবহৃদয়ের গভীরতম প্রদেশের বাণী যাঁরা শুনতে পান, যাঁরা সেই অব্যক্তকে ব্যক্ত করেন, তাঁদের পরস্পরের পরিচয়ের মধ্য দিয়ে, ভাববিনিময়ের মধ্য দিয়ে এক বিশ্বমানবতার পথ প্রশস্ত করা। ইত্যাদি।

সেসব কথা থাক। মস্কোতে এই সম্মেলনের জন্যে গিয়েছিলাম এ কথা সত্য, কিন্তু এই প্রবন্ধের মধ্যে তার স্থান হওয়া উচিত নয়। হলে, সে হবে সম্মেলনের প্রচারকার্য। দীর্ঘ সময় অধিবেশনের পর প্রথম অধিবেশন শেষ হল। তখন আমাদের দেশের অপরাহ্ণ। মিঃ রশিদভ বিদায় নিয়ে বললেন, আমি তাসকেন্দ যাচ্ছি, শেষ অধিবেশনে হয়ত যোগ দিতে পারব, তার পূর্বে নয়; আমাদের তরফে মিঃ সুরকভ রইলেন, মিঃ চেকোভস্কি রইলেন; আপনারা রইলেন, সম্মেলন নিশ্চয় সার্থক হবে।

তিনি গেলেন—নেপালের মহারাজা মহারানী আসছেন তাঁদের

প্রত্যুদ্গমন করে আনবার জন্য। মিঃ রশিদভ সোভিয়েটের মন্ত্রিমণ্ডলীর অন্যতম, সংস্কৃতিবিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সংযুক্ত আরবের মিঃ সিবাই এবং মিঃ সাএদ এল্ দিন্ তাঁরাও রাষ্ট্রীয় বৈদেশিক এবং সংস্কৃতিবিভাগের পদস্থ ব্যক্তি। চীনের মিঃ গে বাও স্যুয়ান এবং মিঃ উয়ান শিউ পো—এঁরাও সরকারের সঙ্গে কোন-না-কোন ভাবে যুক্ত। কেবল আমরা তা নই। জাপানের মিঃ যোশি হোতাও নন। এ নিয়ে মনে মনে একটু গৌরব বোধ করলাম বই কি। মিঃ হোতার সম্পর্কে কোন কথা না-বলেও বলছি। আমাদের যার যে মতবাদই হ'ক ভারতবর্ষের ব্যক্তি-স্বাধীনতার সম্মান এবং মূল্য সবার ঊর্ধ্বে। ভারত সরকার কোন প্রকারেই, এমন কি সামান্য ইঙ্গিতেও এই সম্মেলনে আমাদের কর্তব্যসম্পর্কে কোন একটি কথাও বলেন নি। এই সম্মেলনে যাব কি যাব না এই সম্পর্কে দু-এক জনকে জিজ্ঞাসা করে উত্তর পেয়েছি—যাবেন বই কি।

থাক সে কথা। সম্মেলন চলেছিল চার দিন, প্রথম তিন দিনে দু বেলায় দু'টি, এবং শেষ দিনে প্রেস-কনফারেন্স এবং বিদায়-সম্মেলন একটি—সাতটি অধিবেশন হয়েছিল। এই সাতটির এক-একটিতে এক-এক দেশের প্রতিনিধিদের মুখপাত্র সভাপতিত্ব করেছিলেন। ভারতবর্ষ পেয়েছিল দুটি অধিবেশনে সভাপতিত্বের অধিকার। তৃতীয় অধিবেশন এবং প্রেস-কনফারেন্স ও বিদায়-সম্মেলনের শেষ বিশেষ অধিবেশনে সভাপতিত্বের অধিকার। মুল্কৃরাজ দুটিতেই আমাকে অগ্রগামী করে দিয়েছিলেন। তাঁর আন্তরিকতাকে আমি শ্রদ্ধা করেই এ অধিকার গ্রহণ করেছিলাম। এর মধ্যে কোন কৃত্রিমতা বা কূটনৈতিকতার আভাস পেলে বাংলার রাঢ় দেশের সন্তানের যে রেঢ়ো গোঁ আছে—সেটি জেগে উঠত। বরাবরই সে সতর্ক এবং জাগ্রত ছিল।

সম্মেলনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বা মতবাদের অনুপ্রবেশ-সম্পর্কে সোভিয়েট লেখকরাই সব থেকে সতর্ক, বোধ করি একটু সন্ত্রস্ত

ছিলেন এ কথা না-বললে এ বিষয়ে কঠিনভাবে সমালোচিত সোভিয়েট লেখকদের সম্পর্কে অবিচার করা হবে। সদাজাগ্রত পশ্চিমী শক্তির সঙ্গে এখনও যুদ্ধরত (সে যুদ্ধ যতই ঠাণ্ডা হক) সম্মিলিত আরব রাষ্ট্রের তরুণ প্রতিনিধিরা ইসরায়েল-সম্পর্কে কঠিন মনোভাব নিয়ে এসেছিলেন, ইসরায়েলকে বাদ দেবার প্রস্তাবও তুলেছিলেন; কিন্তু সোভিয়েট তাকে প্রশ্রয় দেয় নি। প্রতিবাদ করেছিলাম আমরা। আমিই বলেছিলাম কথা। বলেছিলাম, কোন বিরোধ কোন কলহকে উদ্দীপ্ত করবার জন্য বা দল বাঁধবার জন্য লেখকেরা সম্মিলিত হতে যাচ্ছেন না, সে লেখকধর্মই নয়; আমাদের লক্ষ্য মৈত্রী ও ঐক্যের এক আনন্দময় পৃথিবী। শত্রুতায় বিদ্বেষজর্জর দ্বিধা বা বহুধাবিভক্ত পৃথিবী নয়। এবং ঐক্যের মধ্যেই আমরা এবং মানবজাতি সার্থক হতে পারি বিরোধের মধ্যে নয়। কিন্তু নবজাগ্রত আরব রাষ্ট্রের নবীন প্রতিনিধিদের রক্ত উষ্ণ; তার উপর এই আরব রাষ্ট্র বর্তমানে এমনই পশ্চিমী আদর্শে অনুপ্রাণিত যে, ক্ষমা মানবপ্রেম এগুলি সম্পর্কে তাঁরা পশ্চিমের মতই বক্র হাস্য করে বলেন, দ্যাট্‌স্ রাবিশ! ওসব হল চরিত্রের দুর্বলতা! এবং রাজনৈতিক বুদ্ধির চাতুর্যে তাঁরা আজ পৃথিবীর দুই শিবিরের বিবদমানতার সুযোগে নিজেদের লাভবান ও শক্তিমান করে তুলতে চাচ্ছেন।

মস্কোর হোটেলগুলি আজ মিশরীতে পরিপূর্ণ। তারা খুব ডাঁটের সঙ্গে ঘুরছে, উচ্চহাস্য করছে, দিলখোলা মানুষের মত উল্লাসে মাতছে। চোখে একটু লাগে। সবারই লাগে। এক-আধ জনকে বলতে শুনেছি, এ যে নূতন প্রেম! কথাটার মধ্যে একটা ইঙ্গিত আছে। সামরিক নেতা নাসের বা আরব রাষ্ট্রের জনসাধারণের প্রকৃতি এবং কম্যুনিজম-এর আদর্শগত পার্থক্য উপলক্ষ্য করেই এ ইঙ্গিত।

যাই হ'ক, এ প্রশ্ন সাময়িকভাবে এড়িয়ে যাওয়া ছাড়া উপায়

ঠিক রইল না। তাসকেন্দে প্রিপারেটরি কমিটির উপর ভারার্পণ করা হল। এ ক্ষেত্রে রাশিয়া গৃহস্থের ভূমিকায় থেকে অসুবিধায় পড়েছে। পরবর্তী আলোচনার মধ্যে যখন পৃথিবীর সকল দেশের বিশিষ্ট লেখকদের নিমন্ত্রণ জানাবার কথা উঠল এবং কোন মতবাদের উপর জোর না-দিয়ে নিমন্ত্রণ জানাবার কথা উঠল, তখন রাশিয়ার লেখকেরাই এ প্রস্তাব সম্ভ্রমের সঙ্গে সর্বাগ্রে সমর্থন করলেন।

এ সম্পর্কে এইখানেই ছেদ টানলাম। শেষের প্রেস-কনফারেন্স সেরে—ফোটোগ্রাফার এবং রেডিয়ো প্রতিনিধির হাতে পড়তে হল। ছবি তুলিয়ে টেপ রেকর্ডিং করিয়ে নীচে নামতেই পড়লাম একটি ছবি-আঁকিয়ে মেয়ের হাতে। কোন-এক পার্বতী অর্থাৎ পার্বত্য দেশের অধিবাসিনী, হয়ত বা মঙ্গোলিয়ার প্রত্যন্তদেশবাসিনী—খাঁদা নাক, ছোট চোখ, গৌরী মেয়েটি, আমাদের দেশের কেশবতীরা যে ধরনের উর্ধ্বঝুঁটি বাঁধেন তাই বেঁধে সকাল থেকে সেই রাত্রি পর্যন্ত হোটেলের লাউঞ্জে বসে নানান্ জনকে ধরে বসিয়ে তাদের ছবি এঁকে থাকেন। বিশেষ করে বিশিষ্ট জনদের। আমাদের মধ্যে শুরু করেছিল—তরুণ সুদর্শন স্বাস্থ্যবান সিবাই ও সাএদ এল্ দিন্ থেকে, তারপর গে বাও, তারপর মুল্ক পর্যন্ত সে এঁকে শেষ করেছিল এতদিনে। আমাকে ধরে নি। না-ধরবারই কথা। ছবি যে আঁকে সে রূপসম্পর্কে সচেতন। যাই হক, শেষ যখন আমাকে ধরলে তখন আর আমার সময় নেই। সে দুঃখ করে বললে, আমার এই পর্যায়ের ছবি অসম্পূর্ণ থেকে গেল।

আকসানা বললেন, পরের বার। আবার আসবেন বানারজী, সে সময় নিশ্চয় সময় দেবেন।

ধন্যবাদ দিতে দিতেই সে ছুটল। একজন লম্বা-চওড়া মানুষ ঢুকেছেন কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে। ছবি আঁকবার মত চেহারা বটে।

আর-একটি নাছোড়বান্দা মেয়ে ঘুরত, সে এক কাগজের

প্রতিনিধি। কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর চাই তার : প্লিজ সার—প্লিজ —ওনলি ফাইভ মিনিটস।

আদায় সে করেছিল। তার সঙ্গে আবার দেখা হয়েছিল 'লিটারারি গেজেট'-এর আপিসে। তার কর্মস্থল ওই বাড়িতেই। ওই বড় বাড়িটিতে অনেক কাগজ এবং সাহিত্যসংস্থার আপিস। 'লিটারারি গেজেট'-এর প্রকাণ্ড আপিস। তার সম্পাদক এবং পদস্থ ব্যক্তিরা গুণী এবং পণ্ডিত ব্যক্তি। এখানে আমাকে অনুরোধ করলেন—ভারতবর্ষের গত কয়েক বৎসরের বিভিন্ন ভাষার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠাবার জন্য। কথা উঠেছিল ওই অনুবাদের প্রসঙ্গ থেকে। আমি বলেছিলাম, আমি জানি না, কীভাবে কোন্ সংস্থা বা ব্যক্তির পরামর্শে আপনারা অনুবাদের কাজ করে থাকেন। যা দেখি বা দেখছি, তাতে ঠিক বিচার হচ্ছে বলে মনে হয় না। এ বিষয়ে আপনারা আমাদের সাহিত্য-আকাদেমির সঙ্গে পরামর্শ করেন না কেন? ধরুন, আজ যদি বর্তমান রাশিয়ার লেখক ও তাঁদের রচনাসম্পর্কে প্রশ্ন করতে হয়, তবে কাকে করব? আপনাদের প্রতিষ্ঠানের মত প্রতিষ্ঠানকে অথবা কোন্ ব্যক্তিকে?

কারণ এ ক্ষেত্রে আমি অকপটেই বলব যে, এ সম্পর্কে আমার সন্দেহ আছে। সে সন্দেহ এই যে, কতিপয় ব্যক্তি, তাঁরা নিঃসন্দেহে ভারতীয়—তাঁরাই এমন ধরনের ধারণার সৃষ্টি করেছেন বা দিয়েছেন, যার জন্য বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা তাঁরা অনুভবই করেন না। হয়ত গ্রন্থখানি সম্পর্কে তাঁদের ধারণা করে দিয়েছেন প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্য বলে। এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত এবং রাশিয়ার বর্তমান কর্তৃপক্ষ দ্বারাও এ কথা স্বীকৃত যে, স্টালিন যুগে সাহিত্যের অবস্থা এই ধরনেরই ছিল। বর্তমানেও সে ধারা ও ধরন, কর্তৃপক্ষ ও লেখকসঙ্ঘের নিয়ন্ত্রণের রীতি ও নীতির অভ্যাস বা প্রচলিত

পদ্ধতি নূতন কালের চেষ্টা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ মুক্ত হয়েছে কি-না বলা শক্ত। কারণ স্টালিনের আমলে যেসব রচনা, যেসব নাট্যাভিনয় নিষিদ্ধ হয়েছিল তার কতগুলির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তোলা হবে সে বিবেচনা এখনও শেষ হয় নি। তা এখনও চলেছে।

আমি যে দিন মস্কো থেকে দেশে রওনা হই সেই দিনই কয়েকখানি নাটক ও নাট্যাভিনয়ের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে দিয়ে সোভিয়েট কাউন্সিল এক উদার ঘোষণা প্রচার করেছেন। এখনও আর কত বই নিষিদ্ধ হয়ে আছে তাই-বা কে বলবে? তার শেষ এখনও হয় নি বা আসে নি। অন্য দিকে হয়ত স্টালিনের আমলের কর্মীরা সে কালের অভ্যাস ও মনোভাব সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে পারছেন না বা পারেন নি। অর্থাৎ প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্যসম্পর্কে এখনও তাঁরা শঙ্কিত ও সতর্ক। আমাদের দেশে যা প্রতিক্রিয়াশীল তা আপনি মরে যায়। আমরা মেরে ফেলবার জন্য খুঁজে বেড়াই না। ও দিকে ওঁদের রীতি তাঁদের নূতন উদারপন্থা সত্ত্বেও এখনও সতর্ক ও শঙ্কিত। তাঁরাই যেখানে পারেন নি সেখানে তাঁদের পরামর্শদাতা বিদেশীরা পারবেন কেমন করে?

এ সম্পর্কে অর্থাৎ এই স্টালিন যুগের মন এখনও কেমনভাবে গোপনে ক্রিয়াশীল রয়েছে—সেই সম্পর্কে একদিনের একটি ঘটনার কথা বলি। যাচ্ছিলাম ট্যাক্সি করে। সঙ্গে কোন রাশিয়ান ছিলেন না, ছিলেন একজন ভারতীয়। যে পথে যাচ্ছিলাম, সেই পথের পাশেই সোভিয়েটের সর্বাধিনায়ক মিঃ ক্রুশ্চেভ থেকে অন্যান্য অধিনায়কদের বাসভবনগুলি পাশাপাশি অবস্থিত। একেবারে রাজকীয়ও নয়, একেবারে মধ্যবিত্তও নয়—অন্তত বাইরে থেকে নয়। আমার সঙ্গের ভারতীয়টি আমাকে প্রথম বাড়ীটি দেখিয়ে বললেন, এই বাড়ীতে মিঃ ক্রুশ্চেভ থাকেন। পাশেরটাতে বুলগানিন।

বলেই ড্রাইভারকে প্রশ্ন করলেন, এইটাতে মিঃ বুলগানিন থাকেন না? (রাশিয়ানে বলছিলেন। পরে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।)

ড্রাইভারটি ঠোঁট উল্টে একটু বিরক্তির সঙ্গে বললে, থাকতেন আগে। এখন কোথায় কী করে বলব? তারপরই বললে, এসব যে কী হচ্ছে! ভাল লাগে না আমাদের। মেলেনকভ-মোলোটভ—তাঁরা আমাদের খুব বড় নেতা—ভাল নেতা ছিলেন। তাঁদের কোথায় পাঠিয়ে দিলে। স্টালিনের আমলের সেই ডিসিপ্লিন অত্যন্ত ভাল ছিল। হ্যাঁ, ভাল ছিল। এসব—

হয়ত আমরা ভারতীয় বা বিদেশী বলেই এ কথা বলেছিল, রাশিয়ান কেউ হলে বলত না। তবে কথাটা এই অতি-সাধারণ মানুষের সকলেই স্টালিন আমলের কঠোরতা থেকে সরে-আসা ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রবর্তন খুব পছন্দ করে না। সেখানে যাঁরা দায়িত্বশীল পদে আসীন—সেখানে তাঁদের না-করাই সম্ভব। কারণ কড়াকড়ির সময় যারা উপরে থাকে তারা বেশী শক্তির অধিকারী হয়। হাতে মাথা কাটে না, কিন্তু যখন কোন দৈবী-শক্তিতে কাটে তখন মানুষ নিজেকে দেবতা ভাবে। তা থেকে বিচ্যুত বা বঞ্চিত হয়ে মানুষ সুখী কখনই হতে পারে না।

ফেরার পথে লেখকদের বাসভবনের পাশ দিয়ে ফিরলাম। শুধু এই দিনই নয়, প্রায় সব কয়দিনই এই বাড়িটির পাশ দিয়ে দু-এক বার গিয়েছি-এসেছি। চমৎকার বিরাট প্রাসাদ। এই প্রাসাদের মধ্যে ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে লেখকরা থাকেন। অনেকে স্বতন্ত্র থাকেন। অনেকের দূর প্রদেশে পল্লীভবন আছে, সেখানে থাকেন। মস্কোতে প্রয়োজনে আসেন। সকলের সঙ্গেই সরকারী যোগ আছে। আগে কঠোর নিয়ন্ত্রণ ছিল বলাই বাহুল্য। সে কঠোরতা নিশ্চয়ই আর নেই। রাশিয়া সব দিক থেকেই স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করছে, সেই কথা যেমন বার বার অনুভব

করেছি তেমনি কথাপ্রসঙ্গে কয়েক বারই এসে গেল যা যাচ্ছে। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কবে হবে জানি না। জীবনের ভুল এবং কর্মের এমনই শক্তি ও প্রবণতা যে, যত তাকে অতিক্রম করতে চেষ্টা করে মানুষ ততই সে নূতন চেহারা নিয়ে ঘুরে-ফিরে আসতে চেষ্টা করে। পুরুষানুক্রমিক আকৃতি বিচিত্রভাবে দু-তিন পুরুষ অতিক্রম করে আত্মপ্রকাশ করে এটা স্বয়ংপ্রমাণিত বিজ্ঞানস্বীকৃত সত্য।

এই দিনই এই ফেরার পথেই রেড স্কোয়ারে আমাদের গাড়ি দাঁড়াল। রাস্তার দু ধারে লোক দাঁড়িয়ে। পুলিশ দাঁড়িয়ে। ক্রেমলিন থেকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদার সঙ্গে মোটরবাহিনী বেরিয়ে চলে গেল। লাল পতাকার সঙ্গে নেপালের পতাকা বাঁধা। নেপালের মহারাজা-মহারানী গেলেন।

বেশ লাগল। ভাল লাগল। সকল পররাষ্ট্রের সঙ্গেই ভারতের এবং ভারতবাসীর অকৃত্রিম প্রীতির সম্পর্ক। আমি জোর করেই বলব—সে প্রীতি, অজ্ঞতার বা মূর্খের সারল্যধর্ম নয়। একমাত্র গোঁড়া হিন্দু যাঁরা এবং যাঁরা এই মনোভাবকে মূলধন করে রাজনৈতিক খেলা খেলতে চান, তাঁরা পাকিস্তান-বিরোধী। আর যাঁরা তার বিপরীত প্রান্তে, যাঁরা সমগ্র পৃথিবীতে মার্কসবাদ-প্রচারের সঙ্কল্প নিয়ে রাজনীতি করছেন—তাঁরা আজ পশ্চিম-বিরোধী বিদ্বেষে জর্জর—অন্যথায় ভারতবর্ষ এই জর্জরতা থেকে মুক্ত—পশ্চিমের সকল সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টার প্রতিবাদ করেও তার প্রতি অপ্রীতি পোষণ করে না। মার্কসবাদীর প্রচার ও প্রসারনীতির সমর্থন না-করেও সকল মার্কসবাদী দেশের সে অকৃত্রিম বন্ধু। প্রীতি তার সবার প্রতি।

তবু নেপালের সঙ্গে এবং পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের এবং এক শ্রেণীর উদ্ধত মানুষের কটূক্তি, শত্রুতাজনক উক্তি মর্মান্তিক বেদনার সঙ্গে সহ্য করেও পাকিস্তানের সঙ্গে প্রীতির অধিক কিছু গাঢ় আত্মীয়তা অনুভব না-করে পারি নে। নেপালের সঙ্গে এমন

কোন বাধাও নেই। তাই সে দিন গাঢ় আনন্দ অনুভব করেছিলাম নেপালের মহারাজা ও মহারানীর সম্মান দেখে। একবার একটু কুটিল ব্যঙ্গাত্মক মনোভাব উঁকি মেরেছিল। মনে হয়েছিল, রাজাকে এবং ধর্মবিশ্বাসী পশুপতিনাথের প্রতিভূ যে রাজা তাঁকে সম্মানিত করছে রাজবাদ-এর এবং ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে শপথ-গ্রহণকারী কম্যুনিস্ট রাশিয়ার শাসক-কর্তৃপক্ষ! মিথ্যার বালুচরের উপর দু পক্ষই জেনে শুনে প্রাসাদ রচনা করছে। যটা দিন থাকে। পরক্ষণেই মনকে শাসিয়েছিলাম অবিশ্বাস কর না। মরুভূমির বুকে সবুজের চিহ্ন দেখে এসেছ রাশিয়ার পথে। কবে একটি বীজ বা কোন মূল উড়ে এসেছিল কোন ঝড়ে; সে মরে নি। এই মরবে কে বললে? মতবাদের পর মতবাদ আসে, নেতার পতনে নূতন নেতার আবির্ভাব হয়, শাসননীতির পরিবর্তন হয়ে নতুন নীতি প্রবর্তিত হয়। তার অন্তরালে হয়ত সজ্ঞান কুটিল চক্রান্ত থাকে অনেক ক্ষেত্রে, কিন্তু মানুষের হৃদয় মানুষের আলোকাভিসারী মন, মানুষের কল্যাণকামী অন্তর, তার সত্যাগ্রহ চিরন্তন—তার সাময়িক ক্ষীণতা আছে কিন্তু ক্ষয় নেই; তার দিক্‌ভ্রান্তি আছে, কিন্তু দাক্ষিণ্যময় বিধাতার দক্ষিণ মুখের অভিমুখী গতির পরিবর্তন হয় নি, হতে পারে না—কখনও হবে না।

নিজেকে তিরস্কার করে শান্তি পেয়েছিলাম।

পরের দিন দেখেছিলাম মস্কো শহরের এক প্রান্তে নূতন-গড়া স্থায়ী একজিবিশন। এটি একাধারে একটি অভিনব বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাশিয়ার প্রচারবিভাগের শ্রেষ্ঠ প্রচারকার্য। প্রচারকার্য শব্দটি কোনক্রমেই নিন্দার্থে ব্যবহার করছি না। রাশিয়ার স্বরূপটি ভুলে ধরা হয়েছে—এই অর্থে ব্যবহার করছি। বিরাট এলাকা-জুড়ে এই একজিবিশন গড়ে তোলা হয়েছে; এই এলাকাটিকে বৃত্তাকারে বেষ্টন করে চমৎকার রাস্তা চলে গিয়েছে, রাস্তায় বাস

চলছে, বাসে চড়ে প্রদর্শনীটিকে প্রদক্ষিণ করে আসতে ঘণ্টা খানেক লাগে; এতেই অনুমান করতে পারবেন এলাকার পরিসর বা পরিধি কতখানি। প্রবেশমুখেই বিস্তৃত প্রবেশপথের দুই দিকে লেনিন ও স্টালিনের বিরাট মূর্তি।

এই প্রদর্শনীর মধ্যে খেত-খামার কলকারখানার মডেলই শুধু নয়, সত্যকারের চাষবাসের হাতে-কলমে কাজ বারো মাস ধরে চলেছে। রাশিয়ার বৈজ্ঞানিক গবেষণার যে অংশ লোকায়ত তারও কাজ চলছে। বিরাট মনোহারী উদ্যান, ফুলে ফুলে অপরূপ শোভা। কত বিচিত্র গঠনের কত ফোয়ারা চারিদিকে। ফোয়ারার উৎক্ষিপ্ত জলধারার উপর নানান্ রঙের আলোকসম্পাতের ব্যবস্থায় অহরহই যেন অসংখ্য রামধনু ফুটে রয়েছে দশ দিক ব্যাপ্ত করে। সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতিটি প্রদেশ বা রিপাবলিকের স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র বাড়ি বা প্যাভেলিয়ন; তার স্থাপত্য সেই প্রদেশের বৈশিষ্ট্য দিয়ে এমনই চিহ্নিত করা হয়েছে যে, বলে দিতে হয় না এ কোন্ রিপাবলিকের প্যাভেলিয়ন। প্যাভেলিয়নের ভিতরে ঢুকলে সেই প্রদেশটির সকল তত্ত্ব ও তথ্যের সঙ্গে শুধু আক্ষরিক পরিচয় না—যথাসম্ভব প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়ে যায়। এবং প্রতিদিন না-হক, মাসে মাসে বা কয়েক মাসের মধ্যেই, প্রদেশগুলির সংগঠনের অগ্রগতির সঙ্গে তত্ত্ব ও তথ্যের পরিবর্তন হয়ে চলে। আক্ষরিক অঙ্কের সংখ্যার পরিবর্তনই না—দেশের যে রিলিফ ম্যাপ গড়া আছে, তাতেও সে পরিবর্তন প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। উরাল পার্বত্য অঞ্চলে বিশাল ভূখণ্ডের পাহাড়কে কেটে সমতল করে কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করা হয়েছে; তাও এখানে দেখতে পাওয়া যায়। যত সে ভূমির পরিমাণ বাড়ে, ম্যাপেও তার পরিবর্তন ঘটে। বোধ করি সত্তর লক্ষ একর জমি এইভাবে কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

অনেক তরুণ খাতায় এই সব সংখ্যা টুকছে, নানান্ প্রশ্ন

করছে, ঘুরছে এবং দেখছে ; তাদের শিক্ষার কাজ চলছে এর মধ্য দিয়ে। শুধু তাই নয়, শুনলাম বিভিন্ন প্রদেশ থেকে চাষী-শ্রমিক-শিল্পীর দল আসে এবং অন্য অন্য প্রদেশের উদ্ভাবিত কৃষিপদ্ধতি, কলকারখানার নব-উদ্ভাবন ও শিল্পীদের কারিগরী বিদ্যাসম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে ও শিক্ষা নিয়ে ফিরে যায়।

মস্কোর অধিবাসীদের এটি হল আনন্দ আহরণের সর্বোৎকৃষ্ট স্থান। শনি-রবিবার ত দলে দলে আসে। রবিবার দিন সকালে আসে, সারাটা দিন এখানে কাটিয়ে রাত্রে ফেরে। ক্যান্টিন, সিনেমা, থিয়েটার, পাপেট থিয়েটার—সবই আছে। এ মোটামুটি ঘুরে দেখতে হলে একটা দিনেও হয়ে ওঠে না। আকসানা ক্রুগসকায়া আমাকে সব দেখাচ্ছিলেন, তাঁর উৎসাহ অপরিসীম কিন্তু আমি অক্ষম ; অক্ষম হয়েছি পায়ের জুতো কাটা-আঙুলের ক্ষতস্থানকে এমনই টিপে ধরে যন্ত্রণা দিচ্ছিল যে, প্রতি মুহূর্তে পাদমেকং ন গচ্ছামি বলে বসে পড়বার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠছিলাম। খোঁড়াচ্ছিলাম অল্প অল্প। শুধু কাটা আঙুলই নয়—গোড়ালিও টাটাচ্ছিল। অহরহ জুতো পায়ে দেওয়া অভ্যাস না-থাকলে যা হয়—ব্যাপারটা তাই। কিন্তু কী জানি বলতে যেন কেমন লজ্জা বোধ করে। ওদের দেশে জুতো পায়ে না-দিয়ে উপায় নেই ; আমাদের দেশে জুতো পরলে ফোস্কা হয়, ওদের দেশে জুতো না-পরলে ঠাণ্ডায় খালি পায়ে ফোস্কা পড়ে। তৎসত্ত্বেও আমাদের দেশে জুতো পায়ে দেওয়া সয় না বলতে নিজেকে অসভ্য স্বীকার করা হয় যে-মনোভাবে এটা আমার সেই মনোভাব। বার কয়েক বসে—বিশ্রাম করে কয়েকটি দেশের প্যাভেলিয়ন দেখে বললাম, আক্সানা, আর না।

ভাল লাগছে না বানারজী ?

না। খুব ভাল লাগছে—অতি চমৎকার। অপূর্বই বলব। আমাদের দেশের সংগঠন মাত্র দশ বছরের, অল্পই কাজ হয়েছে ;

কিন্তু তার মধ্যে কয়েকটি সত্যই বিরাট, আমাদের দেশের পক্ষে বিস্ময়কর। তুমি বোধ হয় ভাকরা নাঙ্গালের নাম শুনেছ। সেগুলি এমন স্থায়িভাবে যদি দেখাবার ব্যবস্থা হত, আমি গৌরব বোধ করতাম; কিন্তু তা নয়, আমার কষ্ট হচ্ছে, আমার পায়ে যন্ত্রণা হচ্ছে।

তবু সে প্রশ্ন করে, কেন? কী হল পায়ে?

বলতে হল।

তারপর সে বললে, তাহলে কোনখানে বসে একটুখানি জিরিয়ে নাও। অন্তত কলকারখানার দিকটা আর ইউক্রেনের প্যাভেলিয়নটা দেখ।

বসতে হল। গোটা তিনেক সিগারেট খেলাম। রাশিয়ান সিগারেট বড্ড নিবে যায় এবং আমার কাছে স্বাদে খুব ভাল ঠেকে নি, খানিকটা টেনে নিবে গেলে আর ধরাতে ইচ্ছে হয় না। শেষ সিগারেট ফেলে দিতেই আকসানা বললে, এখন চল।

বললাম, না। আমার দেখার ধারাটা একটু আলাদা। তোমরা যা সংগঠন করেছ তার অনেক কথা বাইরে থেকে শুনেছি, ছবিতে দেখেছি। আমি দেখেছি বা দেখতে চেষ্টা করেছি—এ দেশের মানুষকে। বড়লোকের বাড়ির শোভাসম্পদ দেখে বিস্ময় জাগে নিশ্চয়, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার বাসিন্দাদের দেখে দুঃখ পেতে হয়। তাই আমার বড় সংগঠন, বিপুল সম্পদের দেশ-সম্পর্কে ভীতি আছে। ইংরেজদের—যেসব ইংরেজ আমাদের দেশে থাকত, তাদের কাছে এ দুঃখ অনেক পেয়েছি। তোমাদের দেশের মতবাদ যারা আমাদের দেশে অনুসরণ করে, তারা দেখেছি অত্যন্ত অসহনশীল এবং উগ্র ও উদ্ধত। কিছু ভাল লোক অবশ্যই আছেন। তাঁদের অবশ্যই নমস্কার করি। তবে অধিকাংশই তাই। তাদের প্রকৃতির এমন পরিবর্তন হয়েছে যে, তার মধ্যে ভারতের বিনয় এবং সহনশীলতার লেশ মাত্র খুঁজে পাই নে। তাই ভয়

ছিল, সেই মতবাদের কেন্দ্রভূমি যে দেশ সে দেশের মানুষকে কেমন দেখব? সত্য বলে নিষ্ঠুর আঘাত পাব না ত? কিন্তু তা পাই নি। তোমরা মুলুকের যে সমালোচনা হাসিমুখে সহ্য করেছ, ক্ষেত্র-বিশেষে ত্রুটি স্বীকার করেছ, তা দেখে ভাল লেগেছে। বিস্ময় বোধ করেছি। কোন দেশের রাজনৈতিক প্রধানদের পরিচয় পাওয়া সহজ নয়; কিন্তু দেশের সাধারণ মানুষই দেশের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। সে পরিচয় আমার কাছে তৃপ্তিদায়ক; আমার এই দেখাই সবচেয়ে বড় দেখা। আমি ফিরতে চাই। পায়েও যন্ত্রণাবোধ করছি এবং মনেও ক্লান্তিবোধ করছি। তোমার সঙ্গে কথাবার্তার মধ্যে যে আনন্দ সে আনন্দ এই ফোয়ারা দেখে, এই সব প্যাভেলিয়ন দেখে আমি পাব না। আমি বোধ হয় কানা-গরু।

কানা-গরু? তার মানে বানারজী?

বললাম, যেসব গরুর দু চোখ আছে তারা যে পথে চলে, কানা-গরু সে পথে চলে না—আলাদা পথে চলে; তার যে চোখটা আছে, একান্তভাবে সে তারই অধীন যে। যে চোখটা আছে, সেই দিকটাতেই ভাঙতে ভাঙতে সে দল ছাড়া হয়ে যায়।

একটু হেসে বললে, তাহলে চল।

ফিরলাম। ফিরবার পথে আকসানা বললে, সত্যিই বানারজী, তুমি একটু আলাদা। মার্জনা কর অনেক জন তোমাকে আন-ইণ্টারেস্টিং মনে করবে।

তাদের আমি দোষ দেব না। দোষ হয়ত আমারই।

না।

ওখানে এত ভিড় কেন বল ত?

সামনেই একটা দোকানে মস্ত কিউ।

জুতোর দোকান।

জুতো এদের সকলের পায়েই দেখেছি। তবুও জুতোর অভাব

আছে। আমাদের দেশ থেকে এ দেশে জুতো আসে। আজ রবিবার লোকের ছুটি, জুতোর দোকানে এসেছে।

কাল সোমবার রাত্রে রওনা হব, মস্কো ছাড়ব। আজ বিকেলে ভারতীয় দূতাবাসে যাব রাষ্ট্রদূত কে. পি. এস. মেননের সঙ্গে দেখা করতে। কাল রওনা হব, কালকের জন্য কোন কাজ রাখি নি।

কয়েকটা দিন মাত্র—ন দিন—ন দিনে বিরাট মস্কো শহরের কতটুকু দেখা হয়? যতটুকু হল, তাই দেখেই ফিরব। বহুবিচিত্র প্রদেশ ও প্রদেশবাসীর সমবায়ে-গঠিত এই বিরাট দেশ এবং জাতির যতটুকু বুঝলাম, তার পরিমাণ যতটুকু হক, তাই আমার কাছে সত্য। সে সত্য প্রকাশ করতে আমার সঙ্কোচ নেই এই হেতু যে, তার সম্পর্কে ভালমন্দ যা-ই এত দিন শুনেছি এবং পড়েছি তার প্রভাব থেকে নিজেকে যথাসাধ্য মুক্ত রেখেই দেখেছি এবং বুঝেছি। এ দিক দিয়ে কটা সুবিধা আমার হয়েছিল—শুধু আমারই বা কেন, সকলেরই হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস—বর্তমান রাশিয়ার নতুন নেতৃত্বের প্রারম্ভেই সদ্য-অতীত নেতৃত্বের রূপটি তাঁরাই প্রকাশ করে দিয়েছেন। অর্থাৎ অতীত কালের রাশিয়া দেখে যাঁরা রাশিয়াকে পৃথিবীর রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে আদর্শ রাষ্ট্র বলে প্রচার করেছেন, মানুষকে অন্নে-বস্ত্রে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে কর্মে-আদর্শে আশ্চর্য মানুষ বলেছেন, নৃত্য-গীতে-উল্লাসে আনন্দবিভোর দেখেছেন, তাঁদের কথাটার প্রতিবাদ তাঁরাই করেছেন। এবং এই ত্রুটিপূর্ণ শাসনে জাতির জীবনের নিদারুণ ভয় ও প্রকাশ-করতে-না-পারা মর্মান্তিক যন্ত্রণার কথা ব্যক্ত করে তাঁরাই যখন বিগত ত্রুটি এবং ভ্রান্তিকে দূর করবার সংকল্প ঘোষণা করেছেন, তখনই চোখে-দেখা এবং আচার-ব্যবহার কথাবার্তা-থেকে-বোঝা বর্তমান রাশিয়া যে অবশ্যই অনেকটা সত্য এ বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। সেই কারণেই এই ক দিনের দেখা

এবং বোঝার কথা পাঠকসমাজের সামনে ধরতে সাহসী হয়েছি। এখন যে কয়েকটি দেখার কথা বলা অবশ্যকর্তব্য বলে মনে হচ্ছে সেই কয়েকটি কথা বলে নিই। ঘটনামূলক কথা।

প্রথম, ওখানকার ভারতীয় সমাজ। মস্কোতে নানান্ কাজে অনেক ভারতীয় রয়েছেন—রেডিয়োতে, সাহিত্যিক সঙ্ঘে, সাংবাদিকতায়, অধ্যাপনাক্ষেত্রে কাজ করছেন। বাংলা দেশের শ্রীযুক্ত নীরেন রায়, বিনয় রায়, সমর সেন, কামাক্ষী চট্টোপাধ্যায়, শুভময় ঘোষ, ননী ভৌমিক আছেন। হিন্দী লেখক রামকুমার বর্মার সঙ্গে দেখা হল। তিনি হিন্দী অনুবাদের কাজে আছেন। ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষানবিস একদল ছাত্রের সঙ্গে 'অ্যানা কারেনিনা' অভিনয় দেখতে গিয়ে আলাপ হয়েছিল। ভারতীয় দূতাবাসে ভারতীয়েরা রয়েছেন। তার মধ্যে শ্রীবিষ্ণু আহুজা এবং তাঁর পত্নী শ্রীমতী আমিনা আহুজাকে অনেকের কাছে চেনা মনে হবে। শ্রীমতী আমিনার মা রাশিয়ান, বাপ ভারতীয়—গায়ের রঙে, মাথার সোনালী ঘনচুলের রাশিতে, চোখের নীলাভতায় একেবারে ইউরোপীয়, আশ্চর্য প্রাণবন্যাময়ী দুরন্ত মেয়ে। এই মেয়েই মহামান্য ক্রুশ্চেভ এবং বুলগানিনের ভারতভ্রমণের সময় দো-ভাষী হয়ে এসেছিলেন। শ্রীবিষ্ণু আহুজাও তাই। আর আছেন আমাদের রাষ্ট্রদূত—মাননীয় কে. পি. এস. মেনন।

রাশিয়া গিয়েই দু-তিন দিনের মধ্যেই একদিন দূতাবাসে গিয়েছিলাম। তখন মাননীয় শ্রী মেনন ও শ্রীমতী মেনন মস্কোতে ছিলেন না। গিয়েছিলেন সমুদ্রোপকূলে। শ্রীযুক্ত আহুজার বাড়িতে একটি মনোরম অপরাহ্ণ উপভোগ করেছিলাম। তাঁরা যেমন ভদ্র তেমনি মার্জিত, নতুন ভারতের যোগ্য নাগরিক। তারপর আর-এক দিন গেলাম—আফগানিস্তান হয়ে ফেরবার জন্য আফগান ভিসা-সংগ্রহে তাঁদের সাহায্যপ্রার্থী হয়ে। দেশে রাজ্য সরকারের সেক্রেটেরিয়েটে যাতায়াত করি; বাংলা দেশে পরিচিত মানুষ

আমি, তবুও মধ্যে মধ্যে ঠোক্কর খাই। কিন্তু মস্কোতে দূতাবাসে যে সাদর, সসম্ভ্রম এবং সাগ্রহ সাহায্য তৎক্ষণাৎ পেয়েছিলাম, তা ভুলতে পারি নে। একেবারে সঙ্গে সঙ্গে কাজ করে দিয়েছিলেন। এবং সাগ্রহে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আর-কোন সাহায্যের প্রয়োজন আছে কি-না বলুন।"

যে দিন ফিরব—৮ই জুন—সেদিন অপরাহ্নে মাননীয় শ্রী মেননের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। বোধ করি ৬ তারিখ তিনি ফিরেছিলেন এবং পরের দিনই অনুরোধ জানিয়েছিলেন দেখা করবার জন্য এবং অসুবিধা না-হলে এক পেয়ালা চা খাবার জন্য। পূর্ব অভিজ্ঞতায় জানি, সকল রাষ্ট্রদূতেরা ঠিক একরকম নন। এক-আধ জনের উৎকট সাহেবিয়ানার সঙ্গে ইংরেজী আমলের আমলাতন্ত্রী চালে যেন সর্বাঙ্গে সূক্ষ্ম শিরীষ কাগজের স্পর্শের মত স্পর্শ বোধ করেছি। গৃহিণীর মেমসাহেবী ঢং বেশ-একটু পীড়া দিয়েছে। সুতরাং সঙ্কোচভরেই গিয়েছিলাম। গিয়ে কিন্তু আশ্চর্য হয়েছি, অভিভূত হয়েছি। মেনন সাহেবের মত এমন শান্ত মধুর ধীর মানুষ বিরল। তাঁর ব্যবহার রাষ্ট্রদূতোচিত নিশ্চয়ই, কিন্তু তার মধ্যে আছে যেন একটি ভারতের বৈষ্ণব। তেমনি কি তাঁর গৃহিণীটি! ভারতীয় নারীর প্রতীক। কপালে সিঁদুরের টিপ, ভারতীয় বেশভূষা, তেমনি প্রসন্ন বিনীত কথাবার্তা। মনে হল, ইউরোপের দূতাবাসে দূতাবাসে এমনই দম্পতি ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে থাকলে ভারতবর্ষের অন্তররূপটি প্রত্যক্ষভাবে ইউরোপের কাছে তুলে ধরা হবে। অনেক প্রচারপত্রিকা দীর্ঘকাল ধরে ইউরোপে বিতরণ করলেও এইভাবে বোঝানো যাবে না। বব-ছাঁটা চুল, রুজ-লিপস্টিকের কৃত্রিম বৈচিত্র্যে বিচিত্রা যাঁরা লম্বা পাইপে সিগারেট খান তাঁদের মধ্যে ইউরোপ তাদের অনুকরণকারী এক জাতকেই দেখে কি অবজ্ঞা করে না? অবশ্য এতে তারা বাইরে খুশীই হয়, তাদের শ্রেষ্ঠত্ববোধও

পরিতৃপ্ত হয়। কিন্তু অন্তরের অন্তরে কী ভাবে তারা? এক সময় ইউরোপীয় প্রভাবে প্রভাবান্বিত ভারতীয় চিত্রকলার রূপ দেখে একজন ইউরোপীয় চিত্রকলা-বিশারদ বলেছিলেন, ইউরোপীয় ধ্যান-ধারণার স্পর্শে প্রাচ্যরুচির কী গভীর দুর্নীতিপূর্ণ বিকার ঘটেছে—তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই সব ছবি। ইউরোপের এ মন হারিয়ে গিয়েছে বা বদলে গিয়েছে বলে আমি মনে করতে পারি নে। স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষের যে সম্মান ও যে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা, সে তার সম্পদের জন্য নয়, তার সামরিক শক্তির জন্য নয়, সম্মান তার ভারতীয় মানসরূপের একটি বিস্ময়কর প্রকাশের জন্য, তার যে মন পঞ্চশীলকে জীবনভাবনার মধ্যে পেয়েছে এবং আচারে আচরণে স্বভাবগত করে তোলার প্রমাণ দিয়েছে সেই মনের জন্য। ভারতবর্ষের খাতির পূর্ব-ইউরোপে বা এশিয়ায় এইজন্য নয় যে এখানে কম্যুনিস্ট পার্টি বলে একটি প্রবল পার্টি আছে এবং পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকায় তার সম্মান কম্যুনিস্ট-বিরোধী দলের অস্তিত্বের জন্য নয়। ইসলাম-জগতে একদা বাগদাদ ছিল সকল রাষ্ট্রের প্রায় কেন্দ্রভূমি। যে রাষ্ট্র যত শক্তিশালী হন, তার একটা বিনীত আনুগত্য থাকত বাগদাদের খালিফের কাছে। আজ পৃথিবীতে দুই দলের দুই বাগদাদ,—যে-কোন একটা দলে নাম লেখালেই ভারতবর্ষের স্বকীয়তা নষ্ট হবে, তখন আর এ প্রতিষ্ঠা থাকবে না, নিজের দলের বাগদাদীদের কাছে বড় জোর ছোট বেরাদারের প্রাপ্য সস্নেহ পিঠচাপড়ানি পাবে এবং বিরোধী দলের বাগদাদ জোটের কাছে শত্রু বলে পরিগণিত হবে। এবং সমগ্র পৃথিবীর মানবসভ্যতার সম্মুখ থেকে নিশ্চিত শান্তির ও প্রেমের পথরেখা, যেটি ভারতীয় জীবনের চলায় চলায় পায়ের চিহ্নে অঙ্কিত হয়ে ভবিষ্যতের দিকে চলছে—তা বন্ধ হয়ে গিয়ে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আজও এই ইউরোপের অন্ধ অনুকরণকারীরা ইউরোপে খানাপিনার আসরে-মজলিসে কুটুম্ব বা ছোট ভাইয়ের

প্রাপ্য ব্যবহার ও সমাদর পান ; কিন্তু তাতে ভারতবর্ষ খাটো হয়, এতে আমার সন্দেহ নেই। আমার এই ধারণার অর্থ এই নয় যে, আমরা ইউরোপের বিশুদ্ধ জ্ঞানবিজ্ঞান এবং তার জীবনধর্ম ও সভ্যতার কল্যাণময়তা ও সত্যকে প্রত্যাখ্যান করব। এখানে ভারতবর্ষের গ্রহণধর্মের উদারতা উদারতর হক। তার এ দিকের সকল বাধানিষেধ-সঙ্কোচশঙ্কা দূরীভূত হক, এই কামনা আমি করি।

পরিপূর্ণ অন্তর নিয়ে ভারতীয় দূতাবাস থেকে ফিরে এলাম। বেলা তখন ছটা। রাত্রি এগারটায় প্লেন ছাড়বে তাসকেন্দ অভিমুখে। জিনিসপত্র অল্পই, এবং তা গুছিয়েই রেখেছি। একটি প্রবন্ধ লিখে ৪৮০ রুব্‌ল্‌ পেয়েছিলাম। সেটা আমি দিতে চেয়েছিলাম লেখক-সম্মেলনের ভাণ্ডারে, কিন্তু তাঁরা তাতে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হচ্ছিলেন বলে আমি আকসানার হাতে দিয়ে বলেছিলাম, তাহলে তুমিই কিছু কিনে এনে দাও, যা দেখে আমি রাশিয়ার কথা মনে করতে পারব। পূর্বেই বলেছি, রাশিয়ার জিনিসপত্রের মূল্য খুব বেশী। অগ্নিমূল্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। অবশ্য যাঁরা উপার্জনক্ষম, তাঁদের জন্য বিশেষ দোকান আছে যেখানে তাঁরা বেশী উপার্জনকারীদের চেয়ে কম দামে জিনিস পান। তবে যিনি যতই উপার্জন করুন, সম্পদ সঞ্চিত হবার পথ সুকৌশল নিয়মে বন্ধ করা আছে। এবং মানুষের মনও বোধ হয় পালটেছে। তারা সঞ্চয় করে না, বৃদ্ধ বয়সের ভাবনা নেই, প্রত্যেকেই পেনশন পাবে, কাজেই তারা উপার্জন বেশী হলে জিনিস কিনে রাখে। তাও সোনাদানা নয়। বৃদ্ধ বয়সের আরামের জিনিস, আনন্দের জিনিস—রেফ্রিজারেটার, আসবাব, টেলিভিশন-সেট এই ধরনের জিনিস। থাক সে কথা। এখন আকসানা যে জিনিসগুলি নিয়ে এলেন, তা আমাদের দৃষ্টিতে দামের অনুপাতে যৎকিঞ্চিৎ মনে হবে। একসেট কাঠের পুতুল, ছটা—জার্মানসিলভার আমরা যাকে বলি—সেই ধাতুর তৈরী চায়ের গ্লাস-হোল্ডার, কিছু রাশিয়ান স্ট্যাম্প (নাতিদের জন্য),

একটা ফাউণ্টেনপেন। এইগুলি ব্যাগে কুলাল না-বলে আকসানা তাঁর নিজের হাতের সুতো-দড়ির একটা হাতে-ঝুলনো ব্যাগ দিলেন। এরপর গিয়ে বসলাম খেতে। শুভময় ঘোষ ঠিক এসেছিলেন। আগেও বলেছি, আবার একবার বলছি এমন মিষ্টপ্রকৃতির উদার ছেলে আমি কমই দেখেছি। জীবনে আশীর্বাদের যদি কোন মূল্য থেকে থাকে তবে তাঁর কল্যাণ অবশ্যই হবে।

শুভময়ের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেয়ে এসেছিলাম একদিন। যেমন শুভময়, তেমনি তার কল্যাণী গৃহিণীটি। ভাত-ডাল-মাছভাজা-ঝোল মায় চাটনি পর্যন্ত রেঁধে সব বাঙালীদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সে দিন মধ্যাহ্নটি মস্কো শহরে বাংলা দেশের একটি মধ্যাহ্নে রূপায়িত হয়েছিল।

আর-এক দিন ভারতীয় সম্মিলিত সমাজ, নাম বোধ হয় ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, তাঁরা আমাদের দু জনকে সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন। কথায় বার্তায় পূর্বে অনুভব করেছিলাম, এখানে এই দিন স্পষ্ট বুঝলাম ভারতীয় প্রবাসীরা মস্কোয় এসে নিজেদের ভারতীয় সত্তাকে যেন নিবিড়তরভাবে অনুভব করছেন। ভারতীয় কম্যুনিস্ট দলের সভ্যরাও এখানে আগে ভারতীয় পরে কম্যুনিস্ট বলে মনে করছেন। ভারতবর্ষ ওঁদের 'আমরা'র মধ্যে পৃথিবীর কম্যুনিস্টরাই গণ্য, সেখানে অ-কম্যুনিস্টরা 'তোমরা' হিসাবে পরিগণিত; কিন্তু এখানে ওঁদের 'আমরা'র মধ্যে আমরাও পরিগণিত। অবশ্য এটা স্বাভাবিক। এঁরা অধিকাংশই মস্কোর সাংস্কৃতিক বিভাগের আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির সমন্বয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে কাজ করেন। মধ্যে মধ্যে এঁদের সংশয়ে এঁরা প্রশ্ন উত্থাপন করেন। রাশিয়ার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিভাগের কর্তারা তার জবাব দিয়ে থাকেন। একটা কথা এখানে বলা বোধ করি কর্তব্য। অন্যথায় সত্য গোপন করা হবে বলে মনে হয়। তাসকেন্দে ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে যাবার ইচ্ছা এঁরা কয়েক জনেই প্রকাশ করেছিলেন।

আমরাও চেয়েছিলাম যে, প্রতিনিধি হিসাবে না-হ'ক, তাসকেন্দের সম্মেলনের আন্তর্জাতিক সেক্রেটেরিয়েটে এঁদের কেউ কর্মী হিসাবে কাজ করলে আমাদের একটা বিশেষ দায়িত্ব কমে যাবে; ভারতবর্ষ থেকে মাস খানেক বা মাস দেড়েক আগে থেকে কাউকে পাঠাতে হবে না। কিন্তু রাশিয়ার লেখকসঙ্ঘের কর্তৃপক্ষ এ প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হন নি। কারণ ঠিক বুঝতে পারি নি। তবে তাঁরা যা বলেছিলেন, তা থেকে এইটুকু মনে হয়েছিল যে, তাঁদের কাজে নিযুক্ত কর্মীদের দিয়ে তাঁরা অভিপ্রায়মত কাজ করিয়ে নিলেন—এমন কথা কেউ বলতে সুযোগ পায় এটা তাঁরা চান না। তাঁরা বোধ হয় পৃথিবীর সন্দেহবাদী-সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বনের জন্যই এ কথা বলেছেন। কিন্তু আমি একটু বোকা বলেই হ'ক, আর ভারতীয় বলেই হ'ক, এ সন্দেহ আমার মনে জাগে নি এবং ভালও লাগে নি।

ঘণ্টায় ঘণ্টায় সময় কমে আসছে। বন্ধুদের কাছে বিদায় নিলাম। আরবের বন্ধুরা আজ সকালেই চলে গিয়েছেন। চীনা বন্ধুরা আরও দু-চার দিন থাকবেন। জাপানী বন্ধু যোশী হোতাও তাই। মুল্‌ক যাবে বার্লিন-ভেনিস-স্টকহোম-প্যারিস-লণ্ডন, সেখান থেকে ফিরবে জুলাই মাসের মাঝামাঝি।

এ কদিনের যাতায়াতের মধ্যে এবং দ্রুত দেখে যাওয়ার প্রণালীতে আরও অনেক কিছু দেখেছি। বিখ্যাত লেনিন লাইব্রেরি, বলসই থিয়েটার—এই দুটির নাম বেশী করে মনে পড়ছে। এ সবের বিবরণ অনেকে বিশদভাবে দিয়েছেন। সুতরাং সে কথা বলব না। এর মধ্যে একটি কথা মনে পড়ছে। সেটি মস্কোর রাজপথে পুলিশের কথা। আমাদের যারা ইংরেজ আমলের মানুষ তাদের কাছে সে আমলের পুলিশের তিক্ত অভিজ্ঞতা মনের মধ্যে একটা সংস্কারের সামিল হয়ে দাঁড়িয়ে

আছে। ঘুচেও ঘুচছে না। তার উপর রুশ দেশের স্টালিন-আমলের পুলিশের কথা পড়েছি। চীনে পুলিশদের কর্তব্যনিষ্ঠার সঙ্গে যেন একটু কঠোরতা দেখেছি বলে মনে হয়েছে। এখানের পুলিশসম্পর্কে কৌতূহল অবশ্যই ছিল। হয়ত বা বিদেশী দেখে বেশ একটি কঠোর সন্দিগ্ধ ভ্রূভঙ্গি দেখব বলে শঙ্কাও ছিল; কিন্তু এ কথা বলব যে, তা দেখি নি। বরং আমাদের বিদেশী দেখে এরা সসম্ভ্রমে সম্মান জানিয়েছে। শুভময় এবং আমি দু জনে একদিন রাস্তা ধরে হাঁটবার সময় মোড়ে মোড়ে তাদের অভিবাদন পেয়েছি। সঙ্গে কোন ইণ্টারপ্রিটার ছিল না, যারা ইঙ্গিত দিয়ে এটা করাতে পারে। সুতরাং এটা কৃত্রিম বলে মনে হয় নি। এবং সাধারণ মানুষকেও আমাদের দেশের ইংরেজ আমলের মত পুলিশ দেখে চকিত হতে দেখেছি বলে মনে হয় না। বলতে পারব না, সত্য কী! তবে যা দেখেছি তাই বা অস্বীকার করব কী করে? যাঁরা গভীর রাজনৈতিক জ্ঞানের অধিকারী, অনেক গুপ্ত খবর রাখেন, তাঁরা হয়ত বলতে পারেন, পুলিশের মার্কা আলাদা আছে। ওরা রাস্তায় থাকে, পাহারা দেয়। সে গুপ্ত পুলিশেরা স্বতন্ত্র। তারা আছে।

ছিল নিশ্চয়ই। তাদের কথা আমরা পড়েছি। বেরিয়ার প্রাণদণ্ড দিয়েছেন বর্তমান রাশিয়ার কর্ণধারেরা। সুতরাং সেটা আজও নেই কে বললে? তর্ক আমি করছি না। তবে আমার নিজের মনে হয়েছে, ওই প্রাণদণ্ড থেকেই কি মনে হয় না ওই নিষ্ঠুর পুলিশী পন্থা তাঁরা পরিহার করেছেন বা করতে চাচ্ছেন? একেবারে উঠে যায় নি, যেতে পারে না; যত দিন রাষ্ট্রনীতি গোপনতার ভিত্তির উপর স্থাপিত, যত দিন জাতিতে জাতিতে মনান্তরে পরস্পরের প্রতি তিক্ত ও বিদ্বেষ-বিষাক্রান্ত; দলে দলে যতদিন মানুষ কলহপরায়ণ; এবং সত্যে অবিশ্বাসী, মিথ্যা ও ছলনাকে আশ্রয় করতে অপরাঙ্মুখ; তত দিন এ থাকবেই।

তবুও সেই এক কথা বলব। মানুষ কখনও কোন ধর্ম বা ইজ্‌মের পাকেই এই ধরনের বন্ধনকে স্বীকার করতে পারে না। ভ্রান্তি এক মহাশক্তি। সে মানুষের জীবনে আছে, তার সঙ্গে প্রতিটি মানুষ এবং সকল মানুষ আমরা অহরহ লড়াই করছি। সুতরাং তারাও করছে। আমাদের দেশের তেলেঙ্গানা, বাংলার তে-ভাগা, তারও পূর্বের জনযুদ্ধের ভ্রান্তির দায়িত্বের কিছুটা রাশিয়াকে স্পর্শ করেছে। এই স্পর্শদোষে রাশিয়া যদি অপবাদগ্রস্ত না-হত, তবে ভারতবর্ষের মানুষ অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে এই সত্যকে অচিরে স্বীকার করত। দ্বিধা রয়েছে এখানে। তবে আমি যা বুঝেছি, তা বলবার আগে আবার একবার বলে নিই—"যা দেবী সর্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা" তিনি অবশ্যই আমাকেও আচ্ছন্ন করে আছেন এবং অন্য সকলকেও আছেন সেই সত্য স্বীকার করেই বলছি যে রাশিয়া তার পূর্বকালের সকল ভ্রান্তি থেকে মুক্ত হয়ে নূতন সহজ পথে আসবার চেষ্টা করছে। কিন্তু তাও সহজ নয়। অত্যন্ত কঠিন। পথ চলতে গিয়ে ভ্রান্তিবশত যখন সুড়ঙ্গপথ রচনা করি, তখন সে অন্ধকারে প্রবেশ করে সেই স্বখাত গহ্বর থেকে ফেরা সহজ হয় না। গহ্বরপথ স্বভাবনিয়মে সঙ্কীর্ণ, ঢুকে পিছন ফেরা কঠিন এবং গহ্বর হলে সে অনেক সময় সমতল থেকে নিম্ন ভূমি হয়। সে হলে তার একটা মাধ্যাকর্ষণ থাকে। অথবা বন্ধনকে কঠিন থেকে কঠিনতর করার সময় যে জটিলতার সৃষ্টি হয় খোলবার সময় সে জট পাকিয়ে গ্রন্থির উপরে নূতন গ্রন্থির সৃষ্টি করে। সে ঘটনা আমাদের সম্মুখেই ঘটে চলেছে। তাই রাশিয়া থেকে ফিরে আসবার পর—যে দিন হাঙ্গেরির ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী ইম্‌রে নেগীর ও তাঁর এক সহকর্মীর ফাঁসির সংবাদ শুনলাম সে দিন দুঃখ অনুভব করলেও বিস্মিত হই নি। গত কালের কর্মপাকের বিপাক তাকে বাধ্য করেছে হাঙ্গেরির এই নিষ্ঠুর কর্মে সমর্থন

দিতে—এইটি বিশ্বাস করি বলেই একটি বহুজনস্বাক্ষরিত প্রতিবাদ-পত্রে স্বাক্ষর না-দিয়ে এই বিবৃতিটি দিয়েছিলাম—

হাঙ্গেরির ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী ইম্‌রে নেগী এবং তাঁহার সহকর্মীর প্রাণদণ্ড, অরাজনৈতিক সকল মানুষের কাছেই একটি মর্মান্তিক দুঃসংবাদ। বিচারের গোপনীয়তা এবং দণ্ডের আকস্মিকতার মধ্যে অন্যায় আক্রোশের অস্তিত্ব সুস্পষ্ট। এই ধরনের কর্ম পৃথিবীর আন্তরিক শান্তিকামনা এবং সদিচ্ছার অমৃতে বিষপ্রয়োগের তুল্য বলিয়া মনে করি। কামনা করি শক্তির এই নিষ্ঠুর কুটিল ক্রিয়াকলাপের অবসান হ'ক। বিশ্বাস, সহনশীলতা এবং ন্যায়-অন্যায়ের সূক্ষ্ম পবিত্রতম বিচারবোধে ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায়রচনার সূচনা হ'ক। আজ আবার কামনা করি কম্যুনিষ্ট দলের মানুষেরা এই বিপাক থেকে মুক্ত হন। এ অন্যায় যাঁহারাই করিয়া থাকুন আমি তাহার প্রতিবাদ জানাই।

আবার আর-একটি ঘটনা রাশিয়ার অন্য এক উজ্জ্বল দিকের পরিচয় দিচ্ছে। সেটি সে দিনের ঘটনা। দিল্লিতে একটি কফি-হাউসে দেখলাম দু জন সাউথ আফ্রিকান কৃষ্ণকায় ছাত্র কফি-হাউসের একটি টেবিলে বসলেন। সে টেবিলে পাঞ্জাবী বসেছিলেন একজন—তিনি উঠে গেলেন। বাংলায় সংস্কৃতিক্ষেত্রে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত অশোক মিত্র এবং বাংলার ডি. এল. আর. শ্রীরঘুনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়ও অনুরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন দিল্লিতে। তাঁরা অবশ্য নিজেরা তাঁদের টেবিলে বসে আলাপ করেছিলেন ওঁদের সঙ্গে। তারা বলেছে—এ এখানে অতি সাধারণ ঘটনা। এবং মিত্র ও বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাঙালী জেনে বলেছিলেন, আপনারা বাঙালী বলেই আমাদের সঙ্গে বসলেন ও আলাপ করলেন। আমরা জানি বাঙালী এ বিষয়ে স্বতন্ত্র। কিন্তু রাশিয়ায় এই বর্ণঘৃণা নেই। এটা তারা জয় করেছে। আরও অনেক কিছু করেছে তার

যতটুকু যেমন বুঝেছি তেমনি বলেছি। তবে ভ্রান্তি আমার থাকতে পারে সে সম্পর্কে আমি সচেতন।

শুধু একটি বিষয়ে ভ্রান্তি আমার নেই বলেই মনে করি।

সে রাশিয়ার সাধারণ মানুষ। এরা প্রাণবান। এরা সরল। এরা ভালবাসতে চায়, এরা ভালবাসার প্রত্যাশী। এরোপ্লেনে ওঠবার সময় সে কথা বিশেষ করে অনুভব করলাম। বিদ্বান বিচক্ষণ মানুষদের মধ্য থেকে সাধারণ মানুষ বেরিয়ে এল। চোখের দৃষ্টিতে তারা উঁকি মারলে। হাতের চাপের ইঙ্গিতে অনুভব করলাম। কণ্ঠস্বরের গাঢ়তায় সে সাড়া দিলে।

প্লেন উঠল ৩৬০০০ হাজার ফিট ঊর্ধ্বলোকে। আকাশের এক দিগন্তে আলোর আভাস, অন্য দিগন্ত গাঢ়কৃষ্ণ, নক্ষত্র-খচিত। সে কথা পূর্বেই বলেছি।

পথের কথা থাক। পথের কথায় গতির পথে এক ঘণ্টা বিরতি ছিল তাসকেন্দে। সে ভোরবেলা। তার মধ্যেই এসেছিলেন তাসকেন্দের লেখকসঙ্ঘের সম্পাদক। চমৎকার একটি গোলাপের তোড়া দিয়েছিলেন। তাসকেন্দ থেকে কাবুল। কাবুলে একটা গোটা দিন থাকবার কথা, কিন্তু ভাগ্যক্রমে সেই দিনই প্লেন পেলাম। এইখানেই সিংহলের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, যিনি অবিকল অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের মত দেখতে।

প্লেন দিল্লিতে এসে নামল রাত্রি দশটায়।

ভারতবর্ষে ফিরে এসে স্বাধীন ভারতবর্ষকে এবং ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকাকে প্রণাম করলাম। তোমার গৌরবেই আমার গৌরব। তোমার পঞ্চশীলের কল্যাণে পৃথিবীর মানুষে মানুষে বিরোধ ঘুচুক। মানুষে মানুষে মিলন হক। তার মধ্যেও তুমি আমার কাছে বিশেষ রূপে বিশেষ গৌরবে অধিষ্ঠিত থাক। সমগ্র পৃথিবীকে প্রণাম করি—সে প্রণাম তোমার চরণপ্রান্তেই রাখলাম আমি।